Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিন ওরাকিল জান্নাত

রোলঃ 228021230

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মিন ওরাকিল জান্নাত

রোলঃ 228021230

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম ও জীবন ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মিন ওরাকিল জান্নাত, আইডিঃ 228021230 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলাম ও জীবন ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মিন ওরাকিল জান্নাত

(স্বাক্ষর)

মিন ওরাকিল জান্নাত

আইডিঃ 228021230

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকা

ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম, যা আল্লাহর কাছে মানবজাতির জন্য পাঠানো সর্বশেষ ধর্মবাণী। শুধু একটি ধর্মীয় বিধান নয়, এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের নির্দেশনা - সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক। এই থিসিসপত্রে আলোচনা করা হবে কীভাবে ইসলাম মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে এবং **কীভাবে মানব** জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। **যে বিষয়গুলো ভূমিকায় না আনলেই নয় সেগুলো নিম্নে ভূমিকার সাব-টপিক হিসেবে পয়েন্ট আকারে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল:-**

১.১ ইসলাম: একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানব জীবনের প্রতিটি দিককে আলোকিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" -সূরা আল-মায়িদা: ৩

এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক—আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—সহ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

১.২ কুরআন ও হাদীস: জীবনের পথপ্রদর্শক

কুরআন ও হাদীস মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনে বলা হয়েছে:

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিক করো না, এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকিন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, দূরবর্তী প্রতিবেশী, সঙ্গী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"

- সূরা আন-নিসা: ৩৬

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করতে প্রেরিত হয়েছি।" মুওয়াত্তা **ইমাম** মালিক

এই হাদীসটি ইসলামে নৈতিকতার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

১.৩ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন

ইসলাম পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সমঝোতার উপর গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ বলেন: "তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো।" - সূরা আন-নিসা: ১৯

সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে- **যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন:** "আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দেন।" - সূরা আন-নাহল: ৯০

১.৪ অর্থনৈতিক জীবন

ইসলাম অর্থনৈতিক জীবনে হালাল উপার্জন ও ন্যায়সঙ্গত ব্যয়ের উপর গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"
- সূরা আল-বাকারা: ২৭৫

এছাড়া, অপচয় ও কৃপণতা থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে: "তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখো না এবং একেবারে খোলাও ছেড়ে দিয়ো না, যাতে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ো।" - সূরা আল-ইসরা: ২৯

১.৫ নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন

ইসলাম নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। কুরআনে বলা হয়েছে: "নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।" - সূরা আল-কলম: ৪

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র উত্তম।"
- সহীহ বুখারী

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানব জীবনের প্রতিটি দিককে সুশৃঙ্খল ও সুশোভিত করে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসরণ করে একজন মুসলিম দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে।

২.ইসলামের মূল বিষয়াবলী

ইসলামের মূল স্তম্ভগুলো হলো: ঈমান (বিশ্বাস), সালাত (নামাজ), সাওম (রোজা), যাকাত (দান), এবং হজ। এগুলো একত্রে ইসলামের ভিত্তি গঠন করে। এগুলো মানব জীবনের ধারাবাহিকতা এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম।

"ইসলামের মূল বিষয়াবলী" শীর্ষক এই অধ্যায়ে একটি মৌলিক বিস্তারিত রূপরেখা নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে-

২.১. তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ)

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

তাওহিদ অর্থ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা। এটি ইসলামের মৌলিক ভিত্তি। তাওহিদ তিনটি ভাগে বিভক্ত:

1. রুবুবিয়্যাহ: আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রক।
2. উলুহিয়্যাহ: শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।
3. আস্মা ও সিফাত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করা।

কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ বলেন:

"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক।"

— সূরা আল-ইখলাস: **১**

হাদীসের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি তাওহিদের সাক্ষ্য দেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" — সহীহ মুসলিম

২.২. আখিরাত (পরকাল ও পুনরুত্থান)

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

আখিরাতে বিশ্বাস অর্থ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস। এই বিশ্বাস একজন মুসলমানের জীবনে নৈতিকতা ও সৎকর্মের প্রেরণা জোগায়।

কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ বলেন:

"যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না, আমি তার জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করেছি।"

— সূরা বনি ইসরাঈল: ১০

হাদীসের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে।" — তিরমিযী

২.৩. রিসালাত (নবুয়ত **ও রাসূলগণের প্রেরণ)**

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

রিসালাত অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বার্তা ও বার্তাবাহকদের প্রতি বিশ্বাস। মুসলমানদের জীবনের সকল দিক এই তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে: তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত।

কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ বলেন:

"আমি **তোমার পূর্বে কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি, যার প্রতি ওহি প্রেরণ করিনি যে, আমার ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।"**

— সূরা **আম্বিয়া: ২৫**

হাদীসের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) **বলেছেন:**

"আমি **শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।"**

— সহীহ **বুখারী**

২.৪. ইবাদত (উপাসনা ও আনুগত্য)

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

ইবাদত অর্থ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী কাজ করা। এর মধ্যে সালাত, সাওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। ইবাদতের মাধ্যমে একজন মুসলমান আল্লাহর নিকটবর্তী হয়।

কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ বলেন:

"আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"

— সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬

হাদীসের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহর একত্বে সাক্ষ্য, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ।"

— সহীহ বুখারী

২.৫. শরীয়াহ (ইসলামী আইন ও বিধান)

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

শরীয়াহ অর্থ ইসলামী আইন ও বিধান, যা কুরআন ও সুন্নাহর উপর ভিত্তি করে। শরীয়াহ মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

কুরআনের নির্দেশনা

আল্লাহ বলেন:

"আমি তোমার জন্য একটি স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি; সুতরাং তুমি তা অনুসরণ করো।"

— সূরা আল-জাসিয়া: ১৮

হাদীসের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"আমি তোমাদের জন্য যা কিছু নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো; এবং যা আদেশ করেছি, তা যথাসাধ্য পালন করো।"

— সহীহ মুসলিম

২.৬. আখলাক (নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন)

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

আখলাক অর্থ নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্র।আখলাক দ্বারা সাধারনত মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের প্রকাশ পায় তাকে বোঝায়। মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক সকল দিকই আখলাকের অন্তর্ভূক্ত।

নামের অর্থ

আখলাক আরবি শব্দ খুলুকুন এর বহুবচন। যার অর্থ চরিত্র বা স্বভাব।

ইসলামে আখলাকের গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে আখলাকের গুরুত্ব অনেক। সকল **নবী**ই নিজ নিজ জাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন। আর উন্নত চরিত্রকে পূর্ণতা দানের জন্য শেষ **নবী** হযরত মুহাম্মদ (স.) কে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন।

২.৭. পাঁচ স্তম্ভের গুরুত্ব

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত। কালেমা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।' এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

এই দুটি বাক্যের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমেই একজন কাফির মুসলিম হয়ে যায়।

১. কালেমার মর্মকথা হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই—এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মুখে উচ্চারণ করা এবং এর দাবি অনুযায়ী আমল করা। পাশাপাশি রাসুল (সা.)-এর নিয়ে আসা শরিয়ত মোতাবেক আমল করা। এবং তিনি যেসব বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা।

২. সালাত ইবাদতসমূহের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি এমন এক ইবাদত, যা বিশেষ কিছু কথা ও কর্মকে শামিল করে, 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে সালাত শুরু হয় এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে শেষ হয়।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা সবার জন্য ফরজ।

৩. জাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া।

নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত সম্পদ ব্যয় করার নাম জাকাত। কোরআনে বহু স্থানে সালাতের সঙ্গে জাকাতের আলোচনা হয়েছে।

৪. রোজার আরবি হলো সিয়াম। সিয়ামের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা।

পুরো রমজান মাস সিয়াম পালন করা ফরজ। এ ছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে নফল রোজা রয়েছে।

৫. হজ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। নির্ধারিত শর্তসহ নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করার জন্য মক্কায় গমনের ইচ্ছা করাকে হজ বলে। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর গোটা জীবনে একবার হজ করা ফরজ।

৩. ইসলামের জীবন দর্শন

ইসলামের জীবন দর্শন মূলত আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপনের কল্যাণময় পথ। এই দর্শন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে এবং দায়িত্ব, ন্যায় ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দেয়।

৩.১. পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়

সাধারণ মুসলিম জনগণ ইসলামকে শুধু একটা ধর্ম হিসেবেই জানে। যারা নিয়মিত নামায-রোযা করে তাদের মধ্যেও অনেকে বাস্তব জীবনে ইসলামের কোনো প্রভাব থাকতে পারে এমন ধারণা রাখে না। জনগণ আলেমসমাজ থেকে ইসলামের যে আলো পেয়েছে এবং তাঁরা দীন ইসলাম সম্পর্কে তাদেরকে যেটুকু ধারণা দিয়েছেন, ঠিক ততটুকুই তারা জানে।

মানুষের জীবনের বহু দিক রয়েছে- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণভাবে এসব দিক থেকে ধর্মীয় দিককে আলাদা মনে করা হয়। অন্যান্য ধর্মে অবশ্য ঐ সব দিক থেকে ধর্ম আলাদাই, কিন্তু ইসলামে ধর্মীয় দিকটি অন্যান্য দিক থেকে আলাদা নয়; বরং সকল দিকের উপরই ধর্মীয় দিকের এমন ব্যাপক প্রভাব রয়েছে যে, মনে হয় সকল দিকই ধর্মীয় দিকের অধীনে রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ধর্মীয় দিকটিই গোটা মানবজীবনের চালিকাশক্তি। আল্লাহ তাআলার দাসত্ব, রাসূল সা. এর আনুগত্য ও আখিরাতের জবাবদিহিতা- এ তিনটি ধর্মীয় নীতি হলেও মুসলমানদের গোটা জীবনের সাথেই এগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মুমিনের জীবনে দীনদারী ও দুনিয়াদারীতে কোনো তফাৎ নেই। ঐ তিনটি ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী কাজ করলে দুনিয়াদারী বলে গণ্য সকল কাজও দীনদারীতে পরিণত হয়।

৩.২. দুনিয়ায় নবী পাঠানোর উদ্দেশ্য

মানুষকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু করতে হয়, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে যাবতীয় আইন-কানুন পাঠিয়েছেন; কিন্তু এসব বিধি-বিধান মেনে চলতে তিনি মানুষকে বাধ্য করেননি। আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা তাঁর দেওয়া আইন-বিধান মেনে চলবে তারা দুনিয়ায়ও শান্তি ভোগ করবে এবং আখিরাতেও পুরস্কার পাবে। আর যারা তা মানবে না এবং

মানুষের মনগড়া নিয়ম মেনে চলবে তারা দুনিয়ায়ও অশান্তি ভোগ করবে, আখিরাতেও শাস্তি পাবে।

আল্লাহর নবীগণ মানুষকে দুনিয়া ত্যাগ করে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী বানাতে আসেননি; বরং তাঁরা মানুষকে দুনিয়ার সকল দায়-দায়িত্ব আল্লাহর তৈরী নিয়মে পালন করার শিক্ষা দিতে এসেছেন। দুনিয়ার সব কাজ নবীদের শেখানো নিয়মে করলে দুনিয়াদারীর কাজও দীনদারী হিসেবে গণ্য হয় এবং সবই ইবাদতে পরিণত হয়।

৩.৩. দীনদারী বনাম দুনিয়াদারী

এক হাদীসে আছে, রাসূল সা. বলেছেন, কোনো লোক ইশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করার পর ঘুমিয়ে গেল। সে যদি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে তাহলে তার সে ঘুমটাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর দেওয়া নিয়মে ঘুমালে ঘুমও ইবাদতে পরিণত হয়। এভাবেই আল্লাহর দেওয়া নিয়মে বিয়ে-শাদি, ঘর-সংসার, রুজি-রোজগার, চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, খাওয়া-দাওয়া এমনকি পেশাব-পায়খানা করাও ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তাই খাঁটি মুমিনের পার্থিব জীবনের সব কাজকর্মই দীনদারী।

সুতরাং দীন ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো শুধু কতক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়। হিন্দুরা কতক পূজা-উপাসনা ও উপবাসের মাধ্যমে ধর্ম পালন করে। খ্রিস্টানরা প্রতি রবিবার গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে। এসব পূজা-উপাসনার সাথে দুনিয়ার অন্য সব কাজের কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলাম এ জাতীয় কোনো ধর্মই নয়। ইসলামের ধর্মীয় কাজগুলোর মাধ্যমে দুনিয়ায় জীবনযাপনের শিক্ষা দেওয়া হয়। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে মোটেই আলাদা নয়।

৩.৪. মুসলিম পরিবারে জন্মিলেই কি মুসলিম হয়ে যায়?

এই যে ইসলামের এ চমৎকার পরিচয় তা আমাদের সমাজের খুব কম লোকেরই জানা আছে। যারা নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে তাদের সবারই ইসলামের এ সুন্দর পরিচয় জানা খুবই জরুরি। ইসলামকে এভাবে না জানলে কেমন করে খাঁটি মুসলমান হওয়া যাবে? আর খাঁটি মুসলমান হতে না পারলে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে দোযখ থেকে নাজাত পাওয়ার কোনো উপায়ই থাকবে না।

লোকেরা মনে করে যে, মুসলিম পরিবারে জন্মিলেই মুসলিম হয়ে যায়- এ ধারণা একেবারেই ভুল। মুসলমানের সন্তানও কাফির হয়ে যেতে পারে। আবার কাফিরের

সন্তানটাও খাঁটি মুসলমান হতে পারে। অতীতকালে কাফিরের সন্তানও নবী হয়েছেন। হযরত ইবরাহীম আ. এর পিতা আযর কাফির ছিল। আবার নূহ আ. এর এক ছেলেও কাফির ছিল। জন্মগতভাবে কেউ মুমিন বা কাফির হয় না। মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হলো ঈমান। ঈমান আনা ও না আনার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ঈমান বা বিশ্বাস মনের ব্যাপার। মনের উপর জোর খাটে না। তাই ঈমান আনার জন্য জোর করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। যখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগানোর বয়স হয় তখন নিজের ইচ্ছায় কাফিরের সন্তানও ঈমানদার হয়ে যেতে পারে, আবার মুমিনের সন্তানও কাফির হয়ে যেতে পারে। মুসলিম হওয়ার জন্য কতক জরুরি গুণের প্রয়োজন। সর্বপ্রথম তাকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী হতে হবে। এরপর তাকে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের কিছু ইলম হাসিল করতে হবে এবং ঈমান ও ইলম অনুযায়ী মুসলিম চরিত্র গঠন করার মতো আমল করতে হবে।

কাফিরের কোনো সন্তান যদি ঈমান, ইলম ও আমলের গুণের কারণে মুসলিম হয়, তাহলে কোনো মুসলিম সন্তানের মধ্যে এসব গুণ না থাকলে তাকে কী কারণে আল্লাহ মুসিলম হিসেবে গণ্য করবেন?

একজন ডাক্তারের সন্তান যদি ডাক্তারি বিদ্যা না শেখে, তাহলে ডাক্তারের সন্তান বলেই কি তাকে কেউ ডাক্তার বলে স্বীকার করবে? কোনো মাস্টারের মূর্খ সন্তান যদি নিজেকেও মাস্টার বলে দাবি করে তাহলে কি কেউ এ দাবি মেনে নেবে?

৩.৫. মুসলিম পরিবারে পয়দা হওয়াও আল্লাহর মেহেরবানী

আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে মুসলমানের ঘরে পয়দা না করতেন তাহলে আমি নিজের চেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করার কোনো সুযোগ পেতাম কি না- জানি না। তাই আল্লাহ তাআলার বিরাট মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে মুসলমান পিতা-মাতার ঘরে পয়দা করেছেন। আমার পিতা যদি আলেম না হতেন এবং তিনি যদি মুসলিম নামধারী হয়েও ঈমান, ইলম ও আমলের ধার না ধারতেন, তাহলে আমাকে তিনি ছোট সময় থেকে মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলতেন না। আমাকে আলেমের ঘরে পয়দা করাটাও মা'বুদের বিরাট মেহেরবানী।

তাহলে বোঝা গেল, যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, তাদেরকেও আল্লাহর দরবারে মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য ঈমান, ইলম ও আমলের চর্চা করতে হবে। যারা লেখাপড়া জানে না, তাদেরকেও যেমন আয়-রোজগার করতে হয়, ঘর-সংসার

করতে হয়, তেমনি মুসলিম হওয়ার জন্যও তাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। এর জন্য সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুনিয়াদি জ্ঞান হাসিল করতে হবে- যাতে মুমিন ও মুসলিম হিসেবে আল্লাহর দরবারে গণ্য হওয়া যায়। তা না হলে আখিরাতে কী দশা হবে সে চেতনাও তারা হারিয়ে ফেলবে।

৩.৬. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সরল অর্থ

ঈমানের মূল বিষয়কে ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত বলা হয়। মুসলমানদের জীবনের সকল দিক এ তিনটি মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে। কালেমা তাইয়েবা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’- এর প্রথম অংশ তাওহীদ এবং দ্বিতীয় অংশ রিসালাত। এ কালেমা বেহেশতে যাওয়ার কোনো মন্ত্র নয়। না বুঝে শুধু এ কালেমা উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে বলে মনে করা একেবারেই ভুল।

যে ব্যক্তি এ কালেমা বুঝে-শুনে কবুল করে, সে আসলে তার জীবনের নীতি বা পলিসি ঘোষণা করে। প্রথম অংশ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দ্বারা সে ঘোষণা করে- “আমি একমাত্র আল্লাহর হুকুমমতো সবকিছু করব এবং আল্লাহর হুকুমের বিরোধী আর কারো হুকুম মানব না।” দ্বিতীয় অংশ ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বলে সে ঘোষণা করে- “মুহাম্মদ সা. যেভাবে যে তরীকা বা নিয়মে আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন, আমি একমাত্র ঐ নিয়মেই আল্লাহর হুকুম পালন করব। তাঁর তরীকা ছাড়া আর কারো তরীকা আমি মানব না।”

মুমিনকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল দিকে যা কিছু করতে হয় তা সবই এ দুটো নীতি অনুযায়ীই করতে হবে। এছাড়া দুনিয়ায় যা কিছু করা হয় তার হিসাব আদালতে-আখিরাতে দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা সকল কাজের হিসাব নিয়ে পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন- এ বিষয়ে পূর্ণ ইয়াকীন রেখেই মুমিনকে দুনিয়ার সবকিছু করতে হয়।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মুমিনের জীবনে ধর্মীয় দিক অন্য সব দিক থেকে আলাদা নয়; জীবনের সকল দিকই ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী চলবে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত মুমিনের জীবনের আসল চালিকাশক্তি।

৩.৭. ‘ইসলাম’ শব্দের অর্থ

ইসলাম আরবী শব্দ। এর অর্থ আত্মসমর্পণ। আত্ম মানে নিজ, সমর্পণ মানে স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়ে দেওয়া। আত্মসমর্পণ অর্থ- নিজেকে অন্য কারো অধীন করে দেওয়া।

কুরআন ও হাদীসে 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা আল্লাহর তাআলার নিকট আত্মসমর্পণ বোঝানো হয়েছে। আর যে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে তাকে 'মুসলিম' বলা হয়। এর সহজ অর্থ হলো নিজের মর্জি ও ইচ্ছামতো না চলে আল্লাহ তাআলার হুকুমমতো চলা। যে এভাবে চলে সে-ই মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী।

ইসলাম শব্দ থেকেই 'আসলামা' শব্দ তৈরী হয়েছে। এর অর্থ সে ইসলাম কবুল করেছে বা আত্মসমর্পণ করেছে। এভাবেই 'আসলামতা' মানে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম বা আত্মসমর্পণ করলাম। যেমন- ইবরাহীম আ. এর কথা কুরআনে আছে,

অর্থাৎ, "আমি সারাজাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করেছি।" (সূরা বাকারাঃ ১৩১)

ইসলাম শব্দের আরেকটি অর্থ হলো শান্তি। 'আস্‌সালামু আলাইকুম' অর্থ আপনার উপর শান্তি নাযিল হোক। আস্‌সালাম ও ইসলাম একই ক্রিয়ামূলের শব্দ। আল্লাহর হুকুমমতো চললেই শান্তি পাওয়া যায়। সকল মানুষই শান্তি চায়। শান্তি পেতে হলে ইসলামের বিধানমতো চলতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে জীবনবিধান পাঠিয়েছেন তার নাম রেখেছেন ইসলাম।

৩.৮. 'দীন' শব্দের অর্থ

আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন (হিসেবে গণ্য)।"

সূরা মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

অর্থাৎ, "তোমাদের জন্য আমি ইসলামকে দীন হিসেবে দিয়ে খুশি হলাম।"

এ দুটো আয়াতে ইসলামকে 'দীন' বলা হয়েছে। আমরা 'দীন ইসলাম' কথাটি বলেও থাকি। অনেকেই দীন ইসলামের বাংলা অর্থ 'ইসলাম ধর্ম' মনে করে। এটা একেবারেই ভুল অর্থ। 'দীন' শব্দের অর্থ না জানার কারণেই এ ভুল করা হয়।

'দীন' অর্থ যদি 'ধর্ম' মনে করা হয় তাহলে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতোই একটা ধর্ম বলে বোঝা যাবে। ইসলাম শুধু মানুষের ধর্মীয় দিকের বিধান দেয়নি, জীবনের সবদিকের বিধানই ইসলাম দিয়েছে। তাই 'ইসলাম ধর্ম' কথাটি সঠিক নয়। 'আল্লাহ' শব্দের যেমন কোনো অনুবাদ দরকার হয় না, তেমনি আরবী 'দীন' শব্দেরও অনুবাদের দরকার নেই। আমরা 'দীন ইসলাম'ই বলব। যেহেতু 'দীন' শব্দের অর্থ 'ধর্ম' বললে আসল অর্থ বোঝা যায় না, তাই 'ইসলাম ধর্ম' কথাটি বলা ঠিক নয়।

কিন্তু ইসলামকে যখন আল্লাহ 'দীন' বলেছেন, তখন দীন অর্থ জানা খুবই জরুরি। 'দীন' শব্দের আসল অর্থ আনুগত্য করা বা মেনে চলা। আমরা বাপ-মায়ের কথা মেনে চলি। দেশের আইন মেনে চলি। আল্লাহকে মেনে চলাই হলো দীন। আর এ দীনের নাম আল্লাহ-ই রেখেছেন 'ইসলাম'। আল্লাহকে মেনে চলার জন্য ইসলাম নামে মানুষকে যে নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান তিনি দিয়েছেন তা-ই 'দীন ইসলাম'।

৩.৯. সব সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ নিয়ম-কানুন দিয়েছেন

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যেমন বিধি-বিধান দিয়েছেন, তেমনি যত কিছু পয়দা করেছেন ছোট-বড় প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই বিধান তৈরী করেছেন। একটা ঘাসের বেঁচে থাকার জন্য কী কী দরকার তা তিনিই ফায়সালা করে দিয়েছেন। পিঁপড়া থেকে হাতি পর্যন্ত সকল জীব, এটম (পরমাণু) থেকে সূর্য পর্যন্ত সকল বস্তুই কতক নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এসব নিয়ম কে বানিয়েছেন? কোনো সৃষ্টি কি এসব নিয়ম নিজে বানাতে পারে? মানুষের শরীরে যত নিয়ম আছে-রক্ত চলাচলের নিয়ম, নিঃশ্বাস নেওয়ার নিয়ম, প্রস্রাব পায়খানার নিয়ম, ঘুমের নিয়ম ইত্যাদি কি মানুষ নিজেরা বানিয়ে নিয়েছে?

পশু-পাখি, গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, ধুলা-বালি পর্যন্ত আল্লাহর বানানো নিয়ম মেনে চলছে। এদের কারো ঐ নিয়ম অমান্য করার শক্তি নেই। বস্তু হোক আর প্রাণীই হোক কেউ নিজের মর্জিমতো চলার ক্ষমতা রাখে না। স্বাধীনভাবে চলার সাধ্য থাকলে একই নিয়মে চলতে বাধ্য হতো না।

৩.১০. ইসলাম কাকে বলে?

এর সহজ উত্তর হলো, সৃষ্টির জন্য স্রষ্টা যে নিয়ম-কানুন বানিয়েছেন তারই নাম ইসলাম। যে সৃষ্টির জন্য যে নিয়ম তিনি দিয়েছেন তা-ই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। সবার জন্য একই নিয়ম তিনি দেননি। যার জন্য যে নিয়ম দিয়েছেন সে নিয়মটাই তার ইসলাম। মানুষের জন্য যে নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান তিনি দিয়েছেন তা মানুষের ইসলাম। সূর্যের জন্য যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা সূর্যের ইসলাম। পানির জন্য দেওয়া বিধান পানির ইসলাম। এভাবে ছোট-বড় সব জিনিস ও জীবেরই নিজস্ব ইসলাম রয়েছে।

ইসলাম দু'রকম

মানুষের ইসলাম ও অন্যান্য সৃষ্টির ইসলামের মধ্যে দু'দিক দিয়ে অমিল আছে। যেমন-
১. মানুষের ইসলাম নবীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। অন্যান্য সৃষ্টির ইসলাম নবীর কাছে পাঠানো হয়নি। এমনকি মানুষের শরীরের জন্য যে ইসলাম তা-ও নবীর মাধ্যমে আসেনি। আল্লাহ তাআলা মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির ইসলাম নবীর মাধ্যমে না

পাঠিয়ে প্রত্যেক সৃষ্টির উপর তার জন্য তৈরীকৃত ইসলাম তিনি নিজে সরাসরি চালু করেন।

২. নবীর মাধ্যমে মানুষের জন্য যে ইসলাম পাঠানো হয়েছে তা আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে নিজে সরাসরি চালু করেন না। যদি তিনি সরাসরি চালু করতে চাইতেন, তাহলে নবী না পাঠিয়ে অন্যান্য সৃষ্টির ইসলামের মতোই মানুষের ইসলামও তিনি নিজেই জারি করতেন। তা না করে তিনি মানুষের ইসলাম নবীর কাছে পাঠিয়ে নবীকেই তা চালু করার দায়িত্ব দিয়েছেন। মানুষের ইসলাম আল্লাহ নিজে চালু করবেন না বলেই নবীর উপর সে দায়িত্ব দিয়েছেন।এ দায়িত্বটাই খিলাফতের দায়িত্ব।

ইসলাম আল্লাহর দেওয়া বিধান। তিনি নিজে তা জারি না করে তাঁর পক্ষ থেকে জারি করার দায়িত্ব নবীকে দিয়েছেন। কারো পক্ষ থেকে অন্য কেউ কোনো কাজ করলে তাকে প্রতিনিধি বা নায়েব বলা হয়। যার পক্ষ থেকে কাজটি করা হয় তিনি হলেন মনিব বা মালিক। খলীফা বা প্রতিনিধি তো মালিক নয়; মালিকের মর্জিমতোই প্রতিনিধিকে কাজ করতে হয়। খলীফা বা প্রতিনিধির কাজটিকেই খিলাফত বলা হয়। প্রতিনিধিকে আরবীতে খলীফা বলে। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা যে ইসলাম রাসূল সা. এর নিকট পাঠালেন তা তিনি খলীফা হিসেবে চালু করার দায়িত্ব রাসূল সা. কেই দিলেন। আল্লাহ নিজে যখন জারি করবেন না, তখন জারি করার দায়িত্ব তো অন্য কাউকেই পালন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন, "তিনি মানুষকে দুনিয়ায় খলীফার দায়িত্ব পালনের জন্যই পয়দা করেছেন।" তাই যে ব্যক্তি রাসূল সা. এর উপর ঈমান আনবে, তাকেও ঐ দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঐ দায়িত্ব পালন না করলে কেউ-ই আল্লাহর খলীফা হিসেবে গণ্য হবে না।

এখানে একটা বড় কথা বুঝতে হবে- আল্লাহ মানুষকে শুধুমাত্র খলীফা হিসেবেই পাঠিয়েছেন। তাই দুনিয়ায় মালিক বা মনিব হওয়ার কোনো ক্ষমতা মানুষের নেই। যদি কোনো মানুষ আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালন করতে না চায়, তাহলে সে যা করবে তাতে সে শয়তানের খলীফা বলেই গণ্য হবে। কারণ, আল্লাহর বিধান যে পালন করে না সে অন্য যে বিধানই মেনে চলে, তা শয়তানের বিধান হিসেবেই কুরআন মাজীদের সূরা আল বাকারা ২০৮ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়ায় মানুষকে খলীফাই হতে হবে; অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ নেই। হয় আল্লাহর খলীফা, আর না হয় শয়তানের খলীফা।

৩.১১. মানুষের দুটো সত্তা

মানুষের শরীর তার আসল সত্তা নয়। আসল মানুষ হলো রূহ। মায়ের পেটে মানুষের শরীরটা তৈরী হওয়ার অনেক আগে আসল মানুষটি পয়দা হয়েছে। কুরআনের মতে পয়লা মানুষ আদমের দেহ তৈরী হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে তাঁর রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দিলেন। আল্লাহ নিজে যে জিনিসটা ফুঁ দিয়ে দিলেন সেটাই আসল মানুষ। কুরআন আরো বলে যে, আদমের পিঠ থেকে সকল রূহকে একসাথে পয়দা করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হবে সবাইকে এক সাথেই সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ায় কাউকে আগে কাউকে পরে পাঠানো হয়।

এ রূহ কোনো বস্তু নয়। এ রূহের কারণেই মানুষ কোন্‌টা ভালো এবং কোন্‌টা মন্দ তা বুঝতে পারে। মানুষ যখন কোনো মন্দ কাজ করে ফেলে তখন মনে খারাপ লাগে। এটাকে আমরা বিবেক বলি। এটা ভালো-মন্দের চেতনা। এটাকে নৈতিক চেতনা বলা হয়। ভালো-মন্দের ধারণা থেকেই এ চেতনা সৃষ্টি হয়। এটাই আসল মানুষ এবং এটাই মনুষ্যত্ব। এ কারণেই খুব বেশি মন্দ চরিত্রের মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়, ঐ লোকটা মানুষই নয়; পশুর চেয়েও মন্দ। কুরআনেও এ রকম লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এরা পশুর মতো; বরং পশুর চেয়েও অধম।"

মানুষের দেহসত্তাটি নৈতিক সত্তা নয়; বস্তুসত্তা মাত্র। আমরা যেসব জিনিস খাই সেসবের মধ্যে যেসব বস্তুসত্তার উপকরণ রয়েছে তা দিয়েই মানুষের শরীর তৈরী হয়েছে। এ কারণেই এসব খাবার দেহের মধ্যে খাপ খায়। মায়ের পেটে এ দেহ তৈরী হওয়ার পর একসময় তাতে রূহকে সওয়ার করিয়ে দেওয়া হয়।

দেহের দাবিগুলোকে কুরআনে নাম দেওয়া হয়েছে 'নাফ্‌স'। দেহের দাবি হলো ক্ষুধা লাগলে খাবার চাওয়া, পিপাসা লাগলে পানি চাওয়া, গরম লাগলে ঠান্ডা চাওয়া, যা সুন্দর তা-ই দেখতে চাওয়া, যা শুনতে মিষ্টি তা-ই শুনতে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সবকিছু মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন বলে সূরা আল বাকারার ২৯ নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন। তাই যত কিছু ভোগ করার জিনিস আছে, তার সবই দেহ বা নাফ্‌স পেতে চায়। এসবের দিকে দেহের বিশেষ ঝোঁক আছে।

পশুর ভালো-মন্দের চেতনা নেই। মানুষের দেহটাও পশুর মতোই। কারণ, এরও নৈতিক চেতনা নেই। হাদীসে দেহটাকে ঘোড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, ঘোড়ায় চড়ে সে যদি লাগাম কষে ঘোড়াকে কাজে লাগাতে পারে তাহলে অল্প সময়ে অনেক দূরে যেতে পারবে; কিন্তু ঘোড়া যদি নিজের মর্জিমতো চলে তাহলে সওয়ারীর

মহাবিপদ। তেমনিভাবে রূহ যদি শরীআতের লাগাম লাগিয়ে নাফ্‌সকে চালাতে পারে তবেই মানুষ সফল হয়। আর যদি না পারে তাহলে সে পশুর চেয়েও অধম হতে বাধ্য হয়।

আমরা সবাই এ বিষয়ে সাক্ষী। আমার নাফ্‌সের দাবিতে যখন আমি কোনো মন্দ কাজ করতে চাই, আমার রূহ (বিবেক বা নৈতিক চেতনা) তখন আপত্তি জানায়। রূহ যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে নাফ্‌সকে দমন করতে পারে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যদি রূহ দুর্বল হয়, তাহলে মন্দ কাজ থেকে ফেরাতে পারে না।

নাফ্‌স ও রূহের মধ্যে এ লড়াইচলার কারণেই মানুষের নাফ্‌সের তিন রকম অবস্থা হয় বলে কুরআনে বলা হয়েছে। যেমন-

১. নাফ্‌সে আম্মারাহ (১৩ পারার পয়লা আয়াত): নাফ্‌স ও রূহের লড়াইয়ে যদি নাফ্‌স সব সময় জয়ী হয় এবং সব সময়ই রূহ হেরে যায় তাহলে এ নাফ্‌সকে 'নাফ্‌সে আম্মারাহ' বলা হয়।

২. নাফ্‌সে লাওয়ামাহ (সূরা কিয়ামার ২ নং আয়াত): এ অবস্থা তখন হয়, যখন এক সময় রূহ জিতে যায় আবার এক সময় নাফ্‌স জিতে যায়।

৩. নাফ্‌সে মুতমাইন্নাহ (সূরা আল ফাজরের ২৭ নং আয়াত): এ অবস্থা তখন হয়, যখন রূহ সবসময় জয়ী হয় এবং নাফ্‌স সবসময় পরাজিত হয়।

ইসলাম মানুষকে এমন শিক্ষাই দেয়, যাতে তার রূহ শক্তিশালী হয় এবং নাফ্‌সের উপর জয়ী হতে পারে। নামায-রোযার উদ্দেশ্যও এটাই।

আল্লাহ যতকিছু সৃষ্টি করেছেন সেসবের পরিচয়

আল্লাহ তাআলা কত কিছু পয়দা করেছেন-তা হিসাব করার সাধ্যও কারো নেই। আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করে তাদের পরিচয় জানতে পারিঃ

১. প্রাণহীন সৃষ্টিঃ যেমন- ইট, পাথর, বালি, চাঁদ, সুরুজ, তারা ইত্যাদি। এসবের মধ্যে জীবন নেই। তাই এরা মরেও না।

২. প্রাণী বা জীবঃ এদের জীবন আছে বলে মরণও আছে।

প্রাণী আবার দু'রকমঃ

১. যেসব প্রাণীর ভালো-মন্দ বোঝার নৈতিক চেতনা আছে। যেমন-ফেরেশতা, জিন ও মানুষ।

২. যেসব প্রাণীর ঐ চেতনা নেই। ফেরেশতা, জিন ও মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের নৈতিক চেতনা নেই।

ফেরেশতা নূরের তৈরী, জিন 'নার' বা আগুনের তৈরী আর মানুষ মাটির তৈরী। ফেরেশতাদের ভালো-মন্দের চেতনা থাকলেও তারা শুধু যা ভালো তা-ই করতে পারে, যা মন্দ তা করার ইখতিয়ার কিংবা ক্ষমতা তাদের নেই। মন্দ করার ক্ষমতা নেই বলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দরকার হবে না। আর বাধ্য হয়ে তারা ভালো কাজ করে বলে তাদের কোনো বাহাদুরী নেই। তাই তারা পুরস্কারও পাবে না।

জিন ও মানুষকে ভালো ও মন্দ দু'রকম কাজ করারই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাই ভালো কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ কাজ করলে তারা শাস্তির যোগ্য হয়। আর মন্দ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মন্দ না করে ভালো কাজ করাটা তাদের কৃতিত্ব। তাই তারা কৃতিত্বের বদলায় পুরস্কার পাবে। এদিক দিয়ে জিন ও মানুষের মিল থাকলেও একটি দিক দিয়ে জিনের চেয়ে মানুষের মার্যাদা আলাদা। তা হলো, মানুষকে আল্লাহ তাআলা খলীফার দায়িত্ব দিয়েছেন; জিনকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব মানুষকে দেওয়ার কারণেই জিন জাতির ইবলিস হিংসা করে শয়তানে পরিণত হয়।

৩.১২. মানুষের জন্য জ্ঞান জরুরি

জ্ঞান মানে জানার বিষয়। মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য যত জীব আছে, তাদের যা কিছু জানা দরকার সেজন্য নিজেদের চেষ্টা করা লাগে না। আল্লাহ তাদের জন্য যে নিয়ম-কানুন বানিয়েছেন তা তিনি নিজেই তাদেরকে শিখিয়ে দেন। তাই তাদেরকে চেষ্টা করে কিছুই শিখতে হয় না। তাদের জন্য কোন্টা দরকার, কোন্টা ভালো ও কোন্টা মন্দ-এর কোনোটাই অন্যদের কাছ থেকে জানতে হয় না। মানুষকে চেষ্টা করে সাঁতার শিখতে হয়। হাঁসকে আল্লাহ তাআলা জন্মগতভাবেই সাঁতার শিখিয়ে দেন।

মানুষকে নিজের ইচ্ছামতো সবকিছু করতে হয়। তাকে জানতে হয় যে, কোন্টা কীভাবে কখন করা দরকার। তাকে নিজের ইচ্ছার ফায়সালা করতে হয় যে, সে আল্লাহর খলীফা হতে চায়, নাকি শয়তানের খলীফা। খিলাফতের এ ইখতিয়ার থাকার কারণেই তাকে নিজের ইচ্ছায় সবকিছু জানার চেষ্টা করতে হয়।

কুকুর মানুষের পায়খানাও খায়; কিন্তু কুকুরের বাচ্চা কখনো নিজের পায়খানা মুখে নেয় না। মানব-শিশু জানার অভাবে নিজের পায়খানাও মুখে দিতে পারে। তাই মানুষকে বাধ্য হয়ে জ্ঞান হাসিল করার চেষ্টা করতে হয়।

জ্ঞানের মূল উৎস কী কী

জ্ঞান তো তালাশ করতেই হবে। কোথা থেকে তা পাওয়া যায় তাও তো জানা জরুরি। যেখান থেকে জ্ঞান হাসিল করা যায় তাকেই জ্ঞানের উৎস বলে। কোন্ কোন্ উৎস থেকে জ্ঞান যোগাড় করতে হবে সর্বাগ্রে তা জানা দরকার। জ্ঞানের উৎস চারটি। যথা- ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ইলহাম ও ওহী। এ উৎসগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা খুবই জরুরি।

ইন্দ্রিয়ঃ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও চামড়া- পাঁচটির সাহায্যে মানব-শিশু পয়লা জ্ঞান লাভ করে। এটা হলো সরাসরি জ্ঞান। যা দেখা যায়, শোনা যায়, যার গন্ধ পাওয়া যায়, স্বাদ নেওয়া যায় তা সবই সরাসরি জ্ঞান।

বুদ্ধিঃ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সামান্য জ্ঞানই হাসিল করা যায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান পায়। বুদ্ধি মানে যুক্তি বা কার্যকারণ। যেমন- চোখ দূরে কোথাও ধোঁয়া দেখতে পেল। বুদ্ধি বলে দিল, সেখানে আগুন লেগেছে; চোখের আগুন দেখার প্রয়োজন হয়নি। যুক্তি বলে দিল যে, আগুন হলেই ধোঁয়া হয়। তাই আগুন না দেখেও বুদ্ধি বলে দিল, আগুন লেগেছে। আরবীতে বুদ্ধিকে ‘আক্‌ল’ বলে।

ইলহামঃ ইলহাম শব্দটি আরবী। সহজ বাংলায় এর অর্থ পাওয়া গেল না। ইংরেজিতে এ উৎসটিতে Intuition বলা হয়। এর অর্থ অভিধানে লেখা হয়েছে ‘স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান’। যে জ্ঞান চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণা করা ছাড়া হঠাৎ পাওয়া যায়। অবশ্য এ রকম জ্ঞান তারাই পায়, যারা চিন্তা-সাধনা করে। কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদগণ কোনো কোনো সময় এমন বিষয়েও ইলহামী জ্ঞান পান, যে বিষয়ে তাঁরা চেষ্টা-সাধনা করেননি।

ওহীঃ আল্লাহর নিকট থেকে নবী-রাসূলগণের নিকট যে জ্ঞান আসে, তাকেই ওহীর জ্ঞান বলা হয়। ওহীর জ্ঞান আল্লাহর নিজের ভাষায়ও আসতে পারে। যেমন- কুরআন মাজীদের ভাষা। নবী-রাসূলের মনে আল্লাহ তাআলা ভাষা ছাড়াও জ্ঞান বা বুঝ দেন, যা তাঁরা নিজের ভাষায় প্রকাশ করেন। নবী-রাসূলগণ নিজের মনগড়া জ্ঞান দান করেন না। তাঁরা যে জ্ঞান দান করেন তা ভাষাসহ বা ভাষাছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। এ জ্ঞানই হলো ওহীর জ্ঞান।

জ্ঞানের এ চার রকমের উৎসের মধ্যে একমাত্র ওহীর জ্ঞানেই কোনো ভুল থাকে না। আল্লাহর তো ভুল হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর কাছ থেকে নবীর নিকট আসা জ্ঞানও অবশ্যই নির্ভুল। কিন্তু বাকি তিনটি উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞান শুদ্ধও হতে পারে, ভুলও হতে পারে। তাই ঐ তিনটির সাহায্যে পাওয়া জ্ঞান ওহীর জ্ঞানের

মাপকাঠিতে যাচাই করেই জানতে হবে- কোন্‌টা শুদ্ধ এবং কোন্‌টা ভুল। ওহীর জ্ঞানই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ চেনার একমাত্র মাপকাঠি।

৩.১৩. ইসলাম কবুল করার নিয়ম

কোনো লোক যদি ইসলাম কবুল করতে চায় তাহলে তাকে কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। সে মুসলিম পরিবারে পয়দা হলেও তাকে এসব নিয়ম মানতে হবে; তা না হলে আল্লাহর দরবারে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না।

'ইসলাম' শব্দ থেকেই 'মুসলিম' শব্দ তৈরী হয়েছে। যে ইসলাম কবুল করল সে-ই মুসলিম হলো। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। মুসলিম মানে যে আত্মসমর্পণ করল বা আত্মসমর্পণকারী। 'মুসলিম' আরবী শব্দ। ফারসি ভাষায় মুসলমান বলা হয়।

সঠিকভাবে ইসলাম কবুল করতে হলে-

১. প্রথমেই মনে মনে ফায়সালা করতে হবে যে, আমি আমার মর্জিমতো চলব না; যা করলে আল্লাহ খুশি হন তা-ই করব।

২. এরপর বুঝে-শুনে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করতে হবে- "আশহাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।" এর তরজমা হলো- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" ইলাহ ও মা'বুদ মানে হুকুমকর্তা, প্রভু বা মনিব।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" কথাটি কালেমায়ে তাইয়েবা নামে পরিচিত। কালেমা মানে কথা। তাইয়েবা মানে পবিত্র। কালেমা তাইয়েবা মানে পবিত্র কথা।

৩. এ কালেমার অর্থ ভালোভাবে বুঝতে হবে। না বুঝে শুধু কালেমা উচ্চারণ করলেই চলবে না। কারণ, কোনো শব্দের অর্থটাই আসল; শব্দটা আসল নয়। যেমন- 'আগুন' একটা শব্দ। এ শব্দের মধ্যে আগুন নেই। আগুন একটা জিনিস। 'আগুন' শব্দ বলে আমরা ঐ জিনিসকেই বুঝি। কালেমা তাইয়েবার মধ্যে যে ক'টি শব্দ আছে, এগুলোর অর্থই আসল। তাই ঐ শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় যে অর্থ বুঝতে হবে তা-ই হলো আসল কালেমা।

৪. কালেমা তাইয়েবার অর্থ

ক. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কথাটি উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয় যে, "আমি শুধু আল্লাহর হুকুম মেনে চলব; তাঁর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানব না।"

খ. ‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ কথাটি উচ্চারণ করে ঘোষণা করা হয় যে, “মুহাম্মদ সা. যে নিয়মে আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন, আমি ঠিক সে নিয়মেই পালন করব; অন্য কারো নিকট থেকে কোনো নিয়ম কবুল করব না।

আসল কথা হলো, কালেমা তাইয়েবা এমন কোনো মন্ত্র নয় যে, না বুঝে শুধু উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে। এ কালেমা হলো জীবনে চলার ২ দফা নীতি বা পলিসি। ঐ দুটো কথা উচ্চারণ করে ২ দফা নীতি ঘোষণা করা হয়, যা আসলে সরাসরি আল্লাহর সাথে ২ দফা ওয়াদা। যে এ ক’টি নিয়ম পালন করে সে-ই ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়ে যায়।

মুসলিমের করণীয় কী?

মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হলে যা কিছু করতে হয় সেসবই মুসলিম হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর শেখানো নিয়মে করতে হবে। কারণ, কালেমা তাইয়েবার মাধ্যমে জীবনে চলার যে ২ দফা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, এর দাবি এটাই। এ নিয়মে চলার জন্যই আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা করা হয়েছে।

এক দিনের ২৪ ঘন্টায় আমরা যা করি তা শুরু হয় সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময়। রাসূল সা. কী নিয়মে ঘুম থেকে উঠেছেন এবং ওঠার পরে কী নিয়মে পেশাব-পায়খানা করেছেন, তা জেনে সে নিয়মেই এসব করতে হবে। তিনি যে নিয়মে ওযূ করেছেন এবং নামায আদায় করেছেন সে নিয়মেই আমাদেরকে করতে হবে।

এভাবে সারাদিন যা কিছু করতে হয়, সবই আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর শেখানো নিয়মে করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া, আয়-রোজগার, ব্যবসা-বাণিজ্য করা ইত্যাদি সবই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা বা নিয়মমতো করতে হবে। রাতে ঘুমানোর সময়ও রাসূলের শেখানো নিয়মে ঘুমাতে হবে।

৩.১৩. মুসলিমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কী?

যেহেতু কালেমা তাইয়েবায় জীবনে চলার ২ দফা নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, সেহেতু মুসলিমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর তরীকা জানার চেষ্টা করা। মুসলিম হিসেবে যা-ই করা হবে, সবই ২ দফা নীতি মেনেই করতে হবে। তাই যে কাজই করা হোক, তা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের শেখানো তরীকা বা নিয়মে করতে হলে তা জানতেই হবে। প্রতিটি কাজের বেলায় আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা না জানলে কাফিরের মতোই চলতে হবে। এ কারণেই মুসলিমের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব জানা বা ইলম তালাশ করা। ইলম মানেই জ্ঞান। এ কারণেই

আল্লাহ তাআলা ওহীর মারফতে রাসূল সা. এর কাছে যে জ্ঞান পাঠিয়েছেন, সে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয বলে রাসূল সা. ঘোষণা করেছেন।

ওহীর জ্ঞান বিশাল। ৩০ পারা কুরআন ও লাখ লাখ হাদীস সবই ওহীর জ্ঞান। ওহীর সব জ্ঞান হাসিল করা ফরয নয়। নবী ছাড়া অন্য কেউ ওহীর সব জ্ঞান হাসিল করতে পারবে না। তাহলে ওহীর কতটুকু জ্ঞান হাসিল করা ফরয?

যার উপর যে কাজের দায়িত্ব আসে ঐ কাজ যেহেতু আল্লাহ তাআলার হুকুম রাসূল সা. এর তরীকা অনুযায়ী করতে হবে, সেহেতু ঐ বিষয়ে যতটুকু ইলম দরকার তা জানা ফরয। যে ব্যবসায় করে না তার ব্যবসায় বিষয়ক ওহীর জ্ঞান হাসিল করা ফরয নয়। যে বিয়ে করেনি তার উপর স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে কীভাবে চলতে হবে, সে জ্ঞান হাসিল করাফরয নয়। বিয়ে করার সাথে সাথে তা ফরয হয়ে যাবে। যার উপর হজ্জ ফরয নয় তার উপর হজ্জের জ্ঞান অর্জনও ফরয নয়। আবার যার সন্তান আছে তার পিতা বা মাতা হিসেবে কী করণীয়, সে বিষয়ে ওহীর জ্ঞান তালাশ করা ফরয।

৩.১৪. বিশেষ জরুরি কথা

মুসলিম পরিবারে পয়দা হলে বাপ-মা যদি নামাযী হয় তাহলে ছোট বয়স থেকেই ছেলে-মেয়ে কুরআন পড়া শেখে, নামাযে অভ্যস্ত হয় এবং নিজেকে মুসলমান বলে বুঝতে শুরু করে; কিন্তু বয়স যখন ১৪/১৫ বছর হয় তখন তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতা হয়। তখন দেখা যায় যে, ছোট সময়ে পাক্কা নামাযী হওয়া সত্ত্বেও তারা নামাযে অবহেলা শুরু করে এবং একসময় নামায ছেড়েই দেয়।

এ কারণেই বোঝার বয়স হলে সচেতনভাবে নিজের ইচ্ছায় কালেমা তাইয়েবাকে বুঝে ঐ ২ দফা নীতি অনুযায়ী চলার সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। ঐ ২ দফা পলিসি ঘোষণার মাধ্যমে যে ওয়াদা করা হয়েছে, সে অনুযায়ী চলার জন্য মযবুত ফায়সালা না করলে সে কিছুতেই ঐ পলিসি মেনে চলতে পারবে না।

যারা বুঝে-শুনে এ ফায়সালা করে না তারা ছোট বয়সে নামাযী হওয়া সত্ত্বেও বুঝের বয়সে বেনামাযী হয়ে সারা জীবনই এভাবে কাটিয়ে দিতে পারে। অল্প বয়সে নামাযী হলে যুবক বয়সে বেনামাযী হয়ে গেলেও বয়স বাড়লে অনেককে আবার নামাযী হতে দেখা যায়।

কিন্তু যে পরিবারে বাবা-মা-ই নামাযী নয় সে পরিবারে যাদের জন্ম, তারা তো ছোট সময়ে কুরআন পড়া ও নামায আদায় করা শেখেই না; বড় হলে তো তাদের মধ্যে মুসলিম চেতনাই দেখা যায় না।

নামায ও রোযা কালেমার ওয়দামতো চলার যোগ্য বানায়

কালেমা তাইয়েবায় আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর তরীকা অনুযায়ী চলার যে ওয়াদা করা হয় সে ওয়াদা পালন করা সহজ নয়। নাফ্সের তাড়না, শয়তানের ওয়াসওয়াসা (কুপরামর্শ) ও মন্দ পরিবেশের চাপে পড়ে মানুষ বিবেকের বিরুদ্ধে চলে। নাফ্সকে বিবেকের অধীনে আনা খুবই কঠিন। এ কঠিন কাজটি সহজ করার জন্যই আল্লাহ তাআলা নামায ও রোযার ব্যবস্থা করেছেন।

নামাযের মাধ্যমে কালেমার ওয়াদা পালনের অভ্যাস হয়

নামায এমন এক আমল, যেখানে নামাযীর মন-মগজ, মুখ, হাত-পা, চোখ-কান সবই ব্যবহার করতে হয়। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময় সর্বাবস্থায় যা কিছু করা বা বলা হয়, তা সবই আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর তরীকামতো করতে হয়। কোনো একটা কাজও নামাযীর নিজের ইচ্ছা বা খাহেশ মতো করা চলে না। এভাবে প্রতিদিন পাঁচ বার নামাযে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো মন-মগজ ও শরীরের সব অঙ্গকে কাজে লাগিয়ে কালেমার ২ দফা ওয়াদা পালনের অভ্যাস করানো হয়।

এর উদ্দেশ্য কী?

আসল উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর তরীকামতো চলার অভ্যাসটাকে নামাযের বাইরেও কায়েম রাখা। নামাযে যেমন মুখে যা ইচ্ছা তা-ই বলা চলে না- আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো বলতে হয়, তেমনি নামাযের বাইরেও মুখে এমন কথা বলা যাবে না, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। নামাযে যেমন দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সিজদায় হাত নিজের খুশিমতো যেখানে-সেখানে রাখা যায় না, নামাযের বাইরেও হাতকে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর তরীকাবিরোধী কাজে ব্যবহার করা যাবে না। নামাযে যেমন চোখ দিয়ে কয়েকটা নির্দিষ্ট জায়গায় দেখতে হয়-উপর দিকে বা ডানে-বাঁয়ে দেখা চলে না, তেমনি নামাযের বাইরে সারাদিন চোখকে এমন কিছু দেখা থেকে ফিরিয়ে রাখতে হবে, যা দেখা নিষেধ।

যদি কেউ নামাযের এ চমৎকার উদ্দেশ্য বুঝে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর তরীকা পালনের অভ্যাস গড়ে তোলে এবং সারাদিনের কাজ-কর্ম ও চলা-ফেরার সময় ঐ অভ্যাসকে তার মন-মগজ, মুখ, চোখ-কান ও হাত-পায়ে চালু রাখে তাহলে সে নামাযের মতোই নামাযের বাইরেও কালেমার ২ দফা ওয়াদা পালন করতে পারবে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সূরা আনকাবূতের ৪৫ নং আয়াতে বলেন,
অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই নামায ফাহেশা (লজ্জাকর) কাজ ও খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে।" নামাযের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার এ কথাটি তাদের জীবনেই সত্য হয়, যারা নামাযে কালেমার ওয়াদা পালনের অভ্যাস করে এবং সে অভ্যাসকে নামাযের বাইরেও কায়েম রাখে।

আল্লাহ তাআলা কিন্তু নামায পড়তে হুকুম করেননি; নামায কায়েম করার হুকুম করেছেন। আমরা নামায পড়ি; কায়েম করি না। নামাযে যে অভ্যাস করানো হয়, সে অভ্যাস যদি নামাযের বাইরের জীবনেও চালু রাখা যায় তাহলে আমাদের জীবনে নামায কায়েম হবে। এভাবে নামাযকে বুঝলে এবং জীবনে মেনে চললে আমাদের নামায আল্লাহর ঐ ঘোষণা অনুযায়ী আমাদেরকে লজ্জাকর ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারবে।

নামায আল্লাহকে ভুলতে দেয় না

আল্লাহ তাআলা সূরা তোয়াহা'র ১৪ নং আয়াতে বলেন,
অর্থাৎ "আমাকে মনে রাখার জন্য নামায কায়েম কর।"

মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করাই নামাযের সঠিক নিয়ম। জামাআতে হাজির হওয়ার চেষ্টা না করে সবসময় ফরয নামায একা একা পড়ার অভ্যাস করলে এ নামায আল্লাহর দরবারে কবুল নাও হতে পারে। কোনো কারণে জামাআতে ফরয নামায আদায় করতে না পারলে তো ঐ নামায বাধ্য হয়ে একাকীই পড়তে হবে; কিন্তু জামাআতে নামায আদায় করার জন্য রাসূল সা. কঠোর তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় যে, অন্য একজনকে নামাযে ইমামতি করতে দিয়ে আমি (মহল্লায়) ঘুরে দেখি- কারা জামাআতে আসল না; এরপর ঐ সব লোকের ঘর পুড়িয়ে দিই, যারা জামায়াতে হাজির হলো না।"

রাসূল সা. আরও বলেছেন, মসজিদে নামায আদায় করলে কমপক্ষে ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। আর ফরয নামায ছাড়া বাকি নামায বাড়িতে পড়লে বেশি সওয়াব।তিনি আরও বলেন, "হাশরের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না, তখন সাত রকম মানুষ ঐ ছায়ায় আশ্রয় পাবে। তাদের একজন ঐ লোক, যার দিল মসজিদের দিকে ঝুলে থাকে।"

এর অর্থ হলো, সে মসজিদে নামায আদায় করার পর বাইরে যখন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে তখনও তার মনটা মসজিদমুখী থাকে এবং কখন আযান হয় সেদিকে খেয়াল রাখে ও সময়মতো জামায়াতে হাজির হয়।

নামায তাকে সব সময় মনে করিয়ে দেয় যে, তুমি সব সময়ই আল্লাহর গোলাম। তুমি আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা করতে পার না। এভাবেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায যে মসজিদে জামায়াতে আদায় করার অভ্যাস করে নেয়, সে আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারে না।

৩.১৫. খাঁটি নামাযীর ২৪ ঘন্টার রুটিন

খাঁটি নামাযীর দিনের ২৪ ঘন্টার কাজ শুরু হয় নামায দিয়ে, শেষেও হয় নামায দিয়ে। ঘুম থেকে ওঠার পরে নামাযের আগে আর কোনো কাজ নেই। পেশাব-পায়খানা ও ওযূ-গোসল তো নামাযের জন্য তৈয়ার হওয়ার উদ্দেশ্যেই করতে হয়। ইশার নামায পড়ে আবার ঘুমিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে দিনের কাজ শেষ হয়। রাসূল সা. বলেন, "যে ইশার নামায জামায়াতের সাথে আদায় করার পর ঘুমিয়ে গেল আবার ফজরের জামায়াতে শামিল হলো, তার আমলনামায় ঘুমকেও ইবাদাত হিসেবে লেখা হবে।"

চার ওয়াক্ত নামায সময়ের শুরুতে আদায় করলে বেশি সওয়াব হয়; কিন্তু ইশার নামায রাতের তিন ভাগের এক ভাগ পার হওয়ার পর পড়লে বেশি সওয়াব। এর উদ্দেশ্য একটাই, যাতে ইশার নামাযের পর তাড়াতাড়ি ঘুমানো যায়। যাতে নামাযে মনটা যে অবস্থায় থাকে, ঐ অবস্থায়ই ঘুমিয়ে পড়া যায়।

এ কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, খাঁটি নামাযীর ২৪ ঘন্টার রুটিন নামাযের অধীন থাকবে; নামায অন্য কাজের অধীন থাকবে না। যেমন- কোনো কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নামাযের সময় মসজিদে না গিয়ে যদি পরে একা নামায পড়া হয় তাহলে নামাযকে কাজের অধীন করা হলো। নামাযের সময় হয়ে গেলে কাজকে মুলতবি করে নামাযে যেতে হবে। তবেই রুটিন নামাযের অধীন হবে।

রোযা নাফ্সকে দমন করার হাতিয়ার

আল্লাহ তাআলা সব মানুষকেই কোন্টা ভালো আর কোন্টা মন্দ, তা বোঝার যোগ্যতা দিয়েছেন। এরপরও মানুষ কেমন করে মন্দ কাজ করে? ইতঃপূর্বে 'নাফ্স ও রূহের লড়াই' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। রূহ যদি দুর্বল থাকে তাহলে নাফ্সের তাড়নায় মানুষ মন্দ কাজ করে। দেহের দাবিকে নাফ্স বলা হয়। দেহের নৈতিক চেতনা নেই বলেই দেহ মন্দ কাজের দিকে টানে। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো-রূহকে এমন শক্তিশালী করা, যাতে সে নাফ্সকে দমন করতে পারে। নামাযও নাফ্সকে দমন করতে

সাহায্য করে। যেমন- শীতের মৌসুমে শরীরটা ফজরের সময় লেপ ছেড়ে উঠতে চায় না। কিন্তু নামাযের অভ্যাস হলে রূহের এতটা শক্তি হয় যে, শরীর বা দেহকে লেপ ছেড়ে উঠতে বাধ্য করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা নাফ্সকে দমন করে এর উপর রূহকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে রোযাকে সবচেয়ে মযবুত হাতিয়ার হিসেবে দিয়েছেন।

দেহের দাবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কড়া দাবি হলো পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধা। পেটে বেশি ক্ষুধা লাগলে মানুষ অস্থির হয়ে যা পায় তা-ই খায়। কঠিন পিপাসা লাগলে পানির জন্য পাগল হয়ে যায়। যৌনক্ষুধা যখন তীব্র হয় তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ধর্ষণের মত খবর পত্রিকায় দেখা যায়, তা ঐ যৌনক্ষুধারই ফল।

রমযান মাসের রোযা ঐ রোগেরই আসল ওষুধ। রমযানে দিন শরু হওয়ার আগে থেকে সূর্য ডোবার সময় পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। পেটের ক্ষুধা ও যৌনক্ষুধার মতো তীব্র দুটো ক্ষুধাকে দমন করতে পারলে নাফ্সের অন্য সব দাবিকে দমন করা সহজ হওয়ারই কথা।

গরমের মৌসুমে রাতের চেয়ে দিন অনেক বড় থাকে। দুপুরের পরে খুব খিদা লাগে। কোনো কোনো সময় খুব পিপাসা লাগে। কিন্তু যে রোযা রাখে সে ক্ষুধা ও পিপাসার ক্ষ্ট সহ্য করে নাফ্সকে দমন করে। এভাবে তার রূহের শক্তি বেড়ে যায়।

রোযা ছাড়া এত লম্বা সময় একটানা কিছুই না খেয়ে কেউ থাকে না। তাই শেষবেলায় ভয়ানক খিদা লাগে। ক্ষুধার জ্বালা কেমন, তা ধনীরা রোযার মাধ্যমে টের পায়। আল্লাহ তাআলার হুকুম ও রাসূল সা. এর তরীকা পালনের ওয়াদা করে যারা মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা কখনও রোযা অবস্থায় গোপনে কিছু খেয়ে ফেলে না। আর কেউ না দেখলেও আল্লাহ যে দেখছেন, সে চেতনার কারণেই এভাবে ভুখ-পিপাসায় কষ্ট পেলেও তা তারা সহ্য করে। রমযানের গোটা মাসটায় একটা কঠিন ট্রেনিং চলে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করে যারা রোযা রাখে তাদের নৈতিক বল বেড়ে যায়। নাফ্সকে দমন করার এ ট্রেনিং মানুষকে নাফ্সের গোলাম হওয়া থেকে বাঁচায় এবং আল্লাহর গোলাম হওয়ার যোগ্য বানায়।

একটা কথা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার, আল্লাহ রোযাদারকে অনেক বেশি সময় ভুখা রেখে কষ্ট দিতে চান না। তাই শেষরাতে দেরি করে খেলে সওয়াব বেশি। ফজরের সময় শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত খাওয়া যায়। ওদিকে সূর্য ডোবার সাথে সাথে দেরি না

করে ইফতার করলে সওয়াব বেশি। ক্ষুধায় বেশি সময় কষ্ট দেওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য নয়।

রোযার হুকুম দিয়ে আল্লাহ রোযাদারকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তুমি নাফ্‌সের গোলাম না হয়ে আমার গোলাম হও। আমি যখন খেতে বলি তখন খাও; যখন খাওয়া বন্ধ করতে বলি তখন বন্ধ করো। তোমার দেহ যখন খেতে চায় তখনই খেতে দেবে না। দেহ দিনের বেলায়ও খেতে চাইতে পারে।

ক্ষুধা মানে খাওয়ার ইচ্ছা। রোযার সময় দুপুরের পর দেহ খেতে চায়; কিন্তু রোযাদার তখন খেদে দেয় না। ভাবখানা এমন যে, আমি আল্লাহর গোলাম; তোর গোলাম নই। আমার মনিবের হুকুমমতো বেলা ডোবার পর খেতে দেব, এর আগে নয়।

এভাবে রোযার মাধ্যমে দেহের দাবিকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহর হুকুম পালন করার অভ্যাস হয়। রোযাদার নাফ্‌সকে রূহের অধীনে আনার যোগ্য হয়। নামায ও রোযা এমন চমৎকার ট্রেনিং, যা মানুষকে কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী চলার যোগ্য বানায়।

যাকাত ও হজ্জ

আল্লাহ যেসব খারাপ কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে টাকা-পয়সা লাগে না; কিন্তু ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করতে অনেক খরচ করা লাগে। মদ-জুয়া, যিনা, নাচ-গান ও অন্যান্য ফাহেশা কাজের দিকে নাফ্‌সের সাংঘাতিক ঝোঁক। এসবই আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। যাদের টাকা-পয়সা বেশি আছে তাদেরই এসব মন্দ কাজ করার সুযোগ হয়।

তাই ধনী লোকদেরকে কালেমার ওয়াদামতো চলার যোগ্য বানানোর জন্য নামায ও রোযা যথেষ্ট নয়। তাদেরকে নাফসের গোলামি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ও হজ্জ ফরয করেছেন। যাকাতের আসল উদ্দেশ্য হলো সমাজের গরীব লোকদের অভাব দূর করা। যাকাত ধনীকে শেখায় যে-

১. ধনের আসল মালিক আল্লাহ। তাই হালাল পথে আয় করতে হবে। কারণ, যাকাত হালাল মাল থেকেই দিতে হয়।

২. আল্লাহর হুকুমমতো যাকাত আদায়ের পর ধনীর হাতে যে মাল থাকে তা যেমন-খুশি তেমন খরচ করা চলবে না; এর আসল মালিকের মর্জিমতো খরচ করতে হবে।

হজ্জের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর মহব্বতে দুনিয়ার সবকিছু কুরবানী দেওয়ার জযবা পয়দা করা। হজ্জের সময় সেলাইছাড়া দু'টুকরা কাপড় পরে অতি দীনহীনভাবে আল্লাহর প্রেমে পাগলপারা হতে হয়। হজ্জ ধনীকে শেখায় যে-

১. ধন বেশি আছে বলেই বিলাসিতা করে ‘ননীর পুতুল’ হয়ে যেও না। হজ্জ করার কষ্ট সহ্য করার যোগ্য হও।
২. যত বড় লোকই হয়ে থাক, সেলাইবিহীন দু’টুকরা কাপড় পরে মক্কা, মিনা ও আরাফাতে আল্লাহপ্রেমিকদের সাথে এক হয়ে নিজের বড়ত্ব ভুলে যাও।
৩. আরাফাতের ময়দানে মহান মনিবের সামনে মাথা নত করে অপরাধীর মতো দাঁড়াও, ধনের অহঙ্কার বাদ দাও। তুমি রাজা-বাদশাহ, শাসন বা বড় কর্তা যা-ই হয়ে থাক- এ কথা খেয়ালে রাখ যে, মরার পর তোমার গায়ের দু’টুকরা কাপড়ের মতো কাফন পরিয়েই তোমাকে কবরে রাখা হবে। তোমার ধন ও মান কোনোটাই সাথে যাবে না।
এভাবে যাকাত ও হজ্জ ধনীদেরকে যা শেখায় যদি তারা তা খেয়ালে রাখে, তাহলে তাদের ধন থাকা সত্ত্বেও তারা কালেমার ওয়াদা পালন করে চলতে পারবে। ধন আছে বলেই নাফ্সের গোলাম হবে না; আল্লাহর গোলাম হওয়ার যোগ্যই থাকবে।

ইসলামের পাঁচটি ভিত

রাসূল সা. বলেছেন, “ইসলাম পাঁচটি ভিতের উপর কায়েম আছে-
১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল,
২. নামায কায়েম করা,
৩. যাকাত আদায় করা,
৪. হজ্জ,
৫. রমযানের রোযা। (বুখারী ও মুসলিম)

কোনো দালান তৈরী করতে হলে পয়লা এর ভিত বা বুনিয়াদ গড়তে হয়। ঐ বুনিয়াদের উপর দেয়াল তোলা হয়। দেয়ালের উপর ছাদ তৈরী করা হয়। ভিত মযবুত না হলে দেয়াল ও ছাদ টেকে না। তাই দালানের জন্য মযবুত ভিতই পয়লা জরুরি।
শুধু ভিতটুকুই দালান নয়, দেয়াল ও ছাদ মিলেই দালান। ঠিক তেমনি ইসলামের ভিত হলো এ পাঁচটি- কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। এ ভিতগুলো মযবুত হলে ইসলামের দালানও মযবুত হবে। তাই এ পাঁচটি ভিত সম্পর্কে এত লম্বা আলোচনা করলাম।
কিন্তু এই পাঁচটি ইসলামের দালানের ভিত মাত্র। ইসলামের দালান ও ছাদের আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল সা. মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করে ইসলামের পুরা দালান তৈরী করেছিলেন। পরিবার, সমাজ আইন, শাসন, বিচার

ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সবই তিনি কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ইসলামের দালান পুরোপুরি কায়েম করে সবচেয়ে শান্তির সমাজ ও দেশ হিসেবে মদীনাকে দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রমাণ করেছিলেন।

আমরা এ পর্যন্ত ইসলামের ভিত সম্পর্কে জানলাম। ইসলামের গোটা দালান সম্বন্ধে আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে।

৪. সমাজ ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে ইসলাম

ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দেশ দেয়। সমাজে দারিদ্র দূরীকরণ এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

৪.১ পরিবার ব্যবস্থা

পরিবার হলো ইসলামের মূল প্রতিষ্ঠান যেখানে আদর্শ জীবনধারা শুরু হয়। এটি সম্মান, আদব ও সহানুভূতির শিক্ষা দেয়। ইসলামী শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সত্যবাদী মুমিন' 'রক্ষণশীল প্রতিনিধি' এবং 'দৃঢ়-বিশ্বাসী' মানুষ তৈরি করা। আল্লাহর পরিচয় জানা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালিন মুক্তি অর্জন করা। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা একমাত্র পরিতৃপ্ত ঈমানী শক্তি দ্বারাই সম্ভব। প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যয়ী হতে হবে। এছাড়াও সঠিক অনুভূতি, বাস্তবধর্মী কর্ম পদ্ধতি, হৃদয়ের সাহস, আমানত ও বিশ্বাসের দৃঢ়টা এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আবশ্যিক উপকরণ। কাজের দক্ষতা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ছাড়া এ লক্ষ্যে পৌঁছা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

আর সম্ভাবনাময় একজন মানুষ গঠন করতে হলে, এ সকল উন্নত গুণাবলীর বীজ মানব শিশুর মূল উৎস শিশু বয়সেই স্থাপন করতে হবে। এ জন্যই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্কই হচ্ছে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা তথা নববী শিক্ষার কারিকুলামের মূল ভিত্তি। কারণ, পরিবারই শিশুর মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। একটি মানব শিশু তার মানসিক ও বৈষয়িক যে কোনোও ধরনের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তখন একমাত্র পরিবারই তার সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা ও ব্যবস্থা করে তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালনের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এজন্যই পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্কই হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। যার ওপর ভিত্তি করে মানবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এজন্যই পবিত্র

আল-কুরআন ও রাসূলের বাণী এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম পরিবার এবং পরিবারের সুসম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আমাদেরকে তাই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে যাতে সঠিকভাবে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করে মুসলিম শিশুদেরকে যথাযথ তা'লীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করে সঠিকভাবে লালন পালন করা যায়। তাদের থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আগ্রাসনের শিকার, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত-অনুকরণ, বিচ্যুতি এবং চিন্তার স্থবিরতা ইত্যাদি অপসারণ করা যায়। বিশেষ করে বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম জাতিকে যেন হিফাযত করা যায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ٢١]

"আর তাঁর নিদর্শনা-বলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: ٧٤]

"যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর"। [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

আল্লাহ আরও বলেন

﴿وَإِذۡ قَالَ لُقۡمَٰنُ لِٱبۡنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِٱللَّهِۖ إِنَّ ٱلشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞ ١٣ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ
بِوَٰلِدَيۡهِ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ وَهۡنًا عَلَىٰ وَهۡنٖ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ ١٤
وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ
سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥ يَٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ
مِّنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِي صَخۡرَةٍ أَوۡ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَوۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِهَا ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٞ ١٦
يَٰبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱنۡهَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ
ٱلۡأُمُورِ ١٧ وَلَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٖ
١٨، وَٱقۡصِدۡ فِي مَشۡيِكَ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩﴾ [لقمان: ١٣-
١٩]

"যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বললেন: হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছর বয়সে। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার দিকেই এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে অবহিত করবো। হে বৎস, কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর খণ্ডের গর্ভে অথবা আকাশে, অথবা ভূগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন-ভেদ জানেন, সবকিছু খবর রাখেন। হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবুর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনোও দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পাদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার আওয়াজ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আওয়াজ"। [সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩-১৯]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلۡكِبَرِ إِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٩ رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ٤٠ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١﴾]ابراهيم :٣٩، ٤١[

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের বার্ধক্য বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণ করেন। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমার রব! কবুল করুন আমাদের দো'আ। হে আমাদের রব আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৯-৪১]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٣١ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٣٢﴾]البقرة :١٣١، ١٣٢[

"স্মরণ করুন, যখন তাকে তার রব বললেন: অনুগত হও। সে বলল আমি বিশ্ব পালকের অনুগত হলাম। এরই অসিয়ত করেছেন ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার সন্তানগণ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মারা যেও না"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩১-১৩২]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنۡ أَعۡمَلَ صَٰلِحٗا تَرۡضَىٰهُ وَأَصۡلِحۡ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓۖ إِنِّي تُبۡتُ إِلَيۡكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنۡهُمۡ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمۡ فِيٓ أَصۡحَٰبِ ٱلۡجَنَّةِۖ وَعۡدَ ٱلصِّدۡقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٦﴾]الاحقاف :١٥، ١٦[

"আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। যাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার রব! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নি'আমতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎ কাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্ম পরায়ণ

কর, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমরা এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হতো"। [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫–১৬]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الاسراء :٢٣، ٢٤]

"তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচার-পূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে নম্র-ভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে রব তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন"। [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]

আল্লাহ আরও বলেন,

﴿وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ وَقَالَ يَٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبۡيَضَّتۡ عَيۡنَاهُ مِنَ ٱلۡحُزۡنِ فَهُوَ كَظِيمٞ ٨٤ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفۡتَؤُاْ تَذۡكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوۡ تَكُونَ مِنَ ٱلۡهَٰلِكِينَ ٨٥ قَالَ إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨٦ يَٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨٧﴾ [يوسف :٨٣، ٨٦]

"এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: হায় আফসোস ইউসুফের জন্য এবং দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। তারা বলতে লাগল: আল্লাহর কসম আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মারা না যান। তিনি বললেন: আমি তো তোমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না"। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৪–৮৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ»

“তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান এবং তার পরিবারের প্রতি দয়াবান[1]।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে ভালো। আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি”।[2]

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন:

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

“চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে, (২) বংশ মর্যাদার কারণে, (৩) শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দীনদারীর কারণে। অতএব, তুমি ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। তোমার দু’হাত ধূলি ধূসরিত (তথা উত্তম) হোক।

ইমাম তিরমিযী রহ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ» «عَرِيضٌ

“যখন তোমাদের নিকট এমন কোনোও দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে”।[3]

ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম রহ. সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"তোমরা স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর, যাতে আমি কিয়ামতের দিন অধিক উম্মতের মাধ্যমে গর্ব করতে পারি।[4]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

«أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

"তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, নেতাও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষও তার পরিবারের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীও তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[5]

এ হচ্ছে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব, একমাত্র পরিবারই হচ্ছে সঠিকভাবে মানব তৈরির কারখানা এবং মানব শিশুর সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। আর ইসলাম পরিবারকে এ ধরনের গুরুত্ব প্রদান- এটা আশ্চর্যের কোনোও বিষয় নয়। কারণ, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। অপরদিকে এ সৃষ্টি জগতের প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানব সন্তানের শিশুকাল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়। এমনকি এক দশকের চেয়েও বেশি সময় অতিক্রম করতে হয় শিশুকাল/বাল্যকাল পাড়ি দিতে। এ জন্যই শিশুকে তার বাল্যজীবনে মানসিক, শারীরিক আত্মিক তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি দেওয়ার

প্রয়োজন হয়। খলিফা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ও প্রস্তুত করার জন্য। আর এ সকল প্রয়োজন একমাত্র পরিবারই দিয়ে থাকে। সুতরাং মানব শিশুর আত্মিক, শারীরিক, বৈষয়িক বিকাশ এবং সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি-অবনতি, ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচক হোক সকল ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।এ সকল কারণে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, কেন ইসলাম পরিবার ও পরিবার গঠন এত বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে এবং পরিবার গঠনকে পৈত্রিক ও মাতৃক সুসম্পর্ক এবং মানুষের ফিৎরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পরিবারের ভীত মজবুত করা এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আর এ জন্যই ইসলাম পরিবার গঠন, মানুষের ফিৎরাত, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অধিকার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

[1] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৭৪০২।

[2] ইবন মাজাহ ও হাকেম।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৪।

[4] আহমদ, হাদীস নং ১২৬১৩।

[5] তিরমিযী, হাদীস নং ১৭০৫।

৪.২ অর্থনৈতিক নীতি

বিনা সুদে ব্যবসার পরামর্শ এবং ন্যায্য বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি। এটি দরিদ্রদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়.।ইসলামী অর্থনীতি বর্তমান বিশ্বের জনপ্রিয় অর্থব্যবস্থা। মুসলিম দেশ ছাড়াও বহু অমুসলিম দেশ এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে। মুসলিম দেশের পাশাপাশি পৃথিবীর অনেক অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংকিং চালু আছে। এ অর্থনীতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় ভরা।

নিম্নে এর কিছু বিবরণ তুলে ধরা হলো—

ইসলামী অর্থনীতি কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন ও সুদকে হারাম করেছেন।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৫)

ইসলামী অর্থনীতিতে আসমান ও জমিনের সব সম্পদে সবার সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন। অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৯)

ইসলামী অর্থনীতিতে বৈধ লেনদেন ও ইজারা ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জন ও রিজিক তালাশের স্বাধীনতা আছে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যা উপজীবিকা স্বরূপ দান করেছি সেই পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তাঁরই উপাসনা করে থাকো।'

(সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭২)

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত কল্যাণের যত্ন করা হয়। তাই প্রতিবেশীকে শুফার অধিকারসহ বিভিন্ন হক প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কোরো না।' (সুরা : ইসরা, আয়াত : ২৬)

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত কল্যাণের ওপর সামাজিক কল্যাণ প্রাধান্য দেওয়া। ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত কল্যাণের ওপর দলের ও সমাজের কল্যাণ প্রাধান্য আছে।

তবে তা হতে হবে ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে। তাই জনসাধারণ চলাচলের জন্য রাস্তার জমিও ছাড় দিতে হয় এবং মানুষের চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে গুদামজাতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, 'ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ৪০ দিন যাবৎ খাবার গুদামজাত করবে সে আল্লাহর জিম্মা থেকে পবিত্র। আল্লাহও তার জিম্মাদারি থেকে মুক্ত।' তেমনি যে মহল্লাবাসীর মধ্যে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি থাকবে তারা আল্লাহর জিম্মা থেকে মুক্ত।' (মুসনাদ আহমদ, হাদিস : ৪৮৮০)

ইসলামী অর্থনীতিতে সব ক্ষেত্রে সুদ হারাম করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও—যদি তোমরা মুমিন হও।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৯)

ইসলামী অর্থনীতিতে সর্বনিম্ন জীবিকার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। ইসলামে প্রত্যেকের সর্বনিম্ন জীবিকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই কেউ অক্ষম হলে তার দায়িত্ব ছেলে বা মা-বাবা বা স্বামী বা আত্মীয়-স্বজনকে গ্রহণ করতে হয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'ধনীদের ধন-সম্পদে আছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ১৯)

ইসলামী অর্থনীতি সৎ চরিত্র দ্বারা বেষ্টিত। তাই একে অন্যকে ধোঁকা, প্রতারণা ও ক্ষতিসাধনের অনুমতি নেই। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ওপর হাতিয়ার উঠাবে সে আমার দলের নয়। আর যে প্রতারণা করবে সে আমার দলের নয়।' (মুসলিম, হাদিস : ১০১)

ইসলামী অর্থনীতিতে অপব্যয় বৈধ নয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, '...অপব্যয় ও অমিতচার করবে না। কেননা আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালোবাসেন না।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩১)

করজে হাসানা ইসলামে স্বীকৃত বিষয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'কে আছ যে আল্লাহকে উত্তমভাবে ঋণদান করবে? অনন্তর তিনি তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ সংকুুচিত বা সচ্ছল করে থাকেন এবং তাঁর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৪৫)

ইসলামী অর্থনীতির উৎস হলো কোরআন, সুন্নাহ, আহকামে ফিকহিয়্যা ও শরয়ি মূলনীতি। (আল ইকতিসাদুল ইসলামী, ওজারাতুল আওকাফ আস সাউদিয়্যা, পৃষ্ঠা ৪)

ইসলামী অর্থনীতির স্তম্ভ তিনটি। এক. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মালিকানার স্বীকৃতি। দুই. ইসলামী শরিয়াহর আলোকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তিন. ভারসাম্যতার মাধ্যমে সামাজিক ইনসাফ। (দারুল ইফতা মিসরিয়্যা, ফতাওয়া দারিল ইফতা মিসরিয়্যা, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৩০৮)

ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা স্বীকৃত। যেমন—মালে গনিমত, খুমুস, ফাই ইত্যাদি।

ইসলামী অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতামূলক স্বাধীনতা আছে। ফলে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (মুনাজ্জামাতুল মুতামারুল ইসলামী, মাজাল্লাতুল ফিকহিল ইসলামী, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৮২০)

সারকথা হলো, ইসলামী অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্বাস ও শরিয়তের বিধানের সম্পর্ক আছে। তবে ইসলামে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত এবং নির্দিষ্ট সীমারেখায় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ফলে ইসলামী অর্থনীতিতে কিছু মূলনীতি খেয়াল করতে হয়।

৫. ইসলাম ও নৈতিকতা

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণের উপর জোর দেয়। এটি সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, ক্ষমাশীলতা ও মানবতার শিক্ষা দেয়।**ইসলাম একটি ধর্ম যা নৈতিকতার উন্নয়নের দিক থেকে অগ্রসর করে। ইসলামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নৈতিকতা মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। ইসলামের নৈতিকতার মৌলিক উদ্দেশ্য হল মানুষের নিরাপত্তা, সমগ্র সমাজের উন্নয়ন এবং পরস্পরের সম্মান রক্ষা করা।**

ইসলামে নৈতিক মূল্যসমূহ বহুল উল্লেখিত হয়েছে, যেমন সত্যবাদ, ইসলামের মূল সূত্র হিসাবে কুরআনে এবং হাদিসের মাধ্যমে প্রদর্শিত করা হয়েছে। ইসলামে সত্যবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক মূল্য, এটি মুসলিমদের জীবনের সর্বাধিক মৌলিক মূল্যগুলি মধ্যে একটি। ইসলামে সত্যবাদ সম্পর্কে কোন দলিল এবং তথ্য আছে না এমন কোনো কথা নেই। ইসলামে সত্যবাদ এবং সত্যের পথে চলা একটি মহৎগুণ।

ইসলামে দারিদ্রতা, অসংখ্য নেক কাজ এবং দুষ্কৃত্য পরিহারের দিক থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলামে সমাজের পরবর্তী উন্নয়ন ও সম্মান উচ্চ মর্যাদা রাখা হয়েছে। ইসলামে মানুষ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ একমাত্র শক্তিশালী এবং নির্দোষ। এছাড়াও, ইসলাম মানবতা এবং দয়ার প্রচারও করে। মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর সম্মান এবং ভালবাসা রয়েছে।ইসলামে নৈতিকতা প্রশ্নের উত্তর করতে একটি পদক্ষেপ হলো ইসলামের মূল ধার্মিক গ্রন্থ কুরআন পড়া। কুরআন অনেক সূত্র সরলভাবে উপস্থাপন করে এবং সূত্রের মধ্যে নৈতিক মূল্যের উল্লেখ থাকে। কুরআনে সামাজিক ও ব্যক্তিগত নৈতিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল হাদিসের অনুসরণ।

৬. আধুনিক জীবনে ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা

আজকের বিশ্বে যেখানে প্রযুক্তি ও সম্প্রচার দ্রুত বর্ধিত হচ্ছে, সেখানে ইসলামের মানবিক ও নৈতিক বাণী একটি শান্তিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের জন্য অপরিহার্য।**খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইসলামী বিশ্বকে একটি সংকটপূর্ণ ও জটিল বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয়। এ বিষয়ে তাদের সঠিক কর্মপন্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে একটি স্থায়ী ও স্বাধীন পৃথিবীতে তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব। বিষয়টি হলো কর্মক্ষম জীবন ও প্রফুল্ল, সাহসিকতা ও সংকল্প এবং উন্নতি ও সম্প্রসারণের ক্ষমতা মূর্তিমান পাশ্চাত্য সভ্যতা। কেননা পশ্চিমা সভ্যতাকে মানব ইতিহাসের অধিক শক্তিশালী ও অতি বিস্তৃত সভ্যতার একটি হিসেবে গণ্য করা যায়।আর বিস্তৃত সভ্যতা এক দিনেই গড়ে ওঠেনি; বরং তা ছিল সেসব প্রভাব ও কার্যক্রমের স্বভাবগত ফলাফল, যা বহুদিন ধরে ইতিহাসে সক্রিয় ছিল এবং যথাসময়ে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। পশ্চিমা সভ্যতার উত্থানে মুসলিম বিশ্বই বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়। কেননা জীবনের কারখানা থেকে যখন সব পুরনো ধর্ম বাদ পড়ে যায়, তখন শুধু ইসলামই ধর্ম ও নৈতিকতার এবং মানবজাতির রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায়। তাই যান্ত্রিক সভ্যতার চ্যালেঞ্জ অন্য কোনো জাতি ও জীবনপদ্ধতির তুলনায় মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামের দিকে প্রবলভাবে ধেয়ে আসে।**

আধুনিক সভ্যতা নিজের প্রশস্ত গণ্ডিতে অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তা আত্মস্থ করেছে। যেমন : আকিদা ও বিশ্বাস, চিন্তা ও চেতনা, তত্ত্বীয় বিধি-বিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন, সামাজিক, প্রাকৃতিত ও নির্মাণশিল্প ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আশ্চর্যজনক ও অভিনব জ্ঞান-বিজ্ঞান পশ্চিমা জাতিগুলো তাদের দীর্ঘ অগ্রযাত্রার নানা পর্যায়ে আত্মস্থ করেছে। তারা সাধারণ মানবিক জ্ঞান, পদার্থ, রসায়ণ, কারিগরি ও গণিতশাস্ত্রে অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করে।তবে পশ্চিমা সভ্যতাকে অবশ্যই একটি মিশ্র সভ্যতাই বলতে হবে। মিশ্র এই সভ্যতা এক পর্যায়ে অসম্পূর্ণ ও আরেক পর্যায়ে সম্পূর্ণ ছিল। তার উপকারী ও ক্ষতিকর উভয় রূপই ছিল। কোনো ক্ষেত্রে সঠিক আবার কোনো ক্ষেত্রে ভুল। কেননা তারা তাদের সন্দেহাতীত জ্ঞানের সঙ্গে এমন ত্রুটিপূর্ণ অনুমান, কল্পনা ও চিন্তা অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে বাদানুবাদ, গভীর চিন্তা ও বিবেচনার স্থান আছে।

সভ্যতায় এমন অংশ ও উপাদান ছিল, যা কোনো বিশেষ দেশ ও জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেমন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। আর এমন জিনিসও ছিল, যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থানীয় প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল এবং পাশ্চাত্য পরিবেশ ও সামাজিকতার গভীর ছাপও তাদের ওপর পড়েছিল। তাতে এমন জিনিসও ছিল, যার দ্বিন ও বিশ্বাসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এমনও অংশ ছিল, যার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্কই ছিল না। পশ্চিমা সভ্যতার এই মিশ্ররূপ মুসলিম বিশ্বকে এক সংকটপূর্ণ ও কঠিন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের নেতা ও চিন্তাবিদদের বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

সভ্যতায় এমন অংশ ও উপাদান ছিল, যা কোনো বিশেষ দেশ ও জাতির জন্য নির্দিষ্ট নয়। যেমন অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। আর এমন জিনিসও ছিল, যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থানীয় প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল এবং পাশ্চাত্য পরিবেশ ও সামাজিকতার গভীর ছাপও তাদের ওপর পড়েছিল। তাতে এমন জিনিসও ছিল, যার দ্বিন ও বিশ্বাসের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এমনও অংশ ছিল, যার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্কই ছিল না। পশ্চিমা সভ্যতার এই মিশ্ররূপ মুসলিম বিশ্বকে এক সংকটপূর্ণ ও কঠিন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের নেতা ও চিন্তাবিদদের বুদ্ধিমত্তার জন্য একটি পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে মুসলিম বিশ্ব তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে— এক. পশ্চিমা সমাজ-সভ্যতার বিরোধিতা করা। অর্থাৎ মুসলিমরা এই সভ্যতার সব ফলাফল ও উপকারিতাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে। তার কোনো ভালো বা মন্দ কথা শুনতে ইচ্ছুক হবে না।দুই. নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে পশ্চিমা সভ্যতা থেকে একদিকে সরে পড়া এবং তা থেকে কোনো ফল ভোগ না করা, এমন তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখা, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। যেমন : পদার্থ, গণিত ও কারিগরি জ্ঞান।তিন. সতর্ক ও সচেতনতার সঙ্গে গ্রহণ ও বর্জন করা। ইসলামী শরিয়তের মূলনীতির আলোকে পশ্চিমা সভ্যতাকে মেপে দেখা এবং সে আলোকেই কোনো গ্রহণ বা কোনো বর্জন করা। পশ্চিমা সভ্যতার ব্যাপারে এটাই ইসলামের প্রকৃত অবস্থান।

ভালো-মন্দ বিচার না করে আধুনিক সমাজ ও সভ্যতাকে বর্জন করার অর্থ হলো মুসলিম বিশ্বকে পিছিয়ে রাখা এবং জীবনপথের দ্রুতগামী যাত্রীদল থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া। এতে মুসলিম বিশ্ব অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তা একটি দ্বীপে

পরিণত হবে। সমুদ্রে এমন বহু দ্বীপ হওয়া সম্ভব। কিন্তু স্থলভাগে এ ধরনের দ্বীপের কোনো স্থান নেই। বস্তুত সংকীর্ণমনা মানুষই এই নীতি গ্রহণ করে থাকে। এতে প্রাকৃতিক শক্তি ও অগ্রযাত্রার ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা দ্বিনের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনাও নয়। কেননা ইসলাম জগতে জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ জোর দিয়েছে।উপকারী জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। বরং তা দ্বিনের রক্ষণাবেক্ষণ ও শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে মুসলিমদের যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আকাশ ও জমিনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত-দিনের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন আছে। সেসব জ্ঞানীদের জন্য, যারা কখনো আল্লাহবিমুখ নয়; বরং যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর জিকির করে। আর তাদের বৈশিষ্ট্য হলো আকাশ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (তারা বলে) হে আল্লাহ, এই সমস্ত যা আপনি সৃষ্টি করেছেন তা নিঃসন্দেহে অকেজো ও অনর্থক নয়। আপনিপূতঃপবিত্র। আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০-৯১)।

৭. ব্যক্তি জীবন ও ইসলামের প্রতিফলন

ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি এবং চরিত্র উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয় যা সামাজিক উন্নতির জন্য আবশ্যক।ইসলাম মানে শান্তি, ইমান মানে নিরাপত্তা। ইসলামের উদ্দেশ্য ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন নিরাপত্তা। ইসলামি জীবনাদর্শ বিশ্বের সব মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য। পৃথিবীর সব মানুষের ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ইসলামের লক্ষ্য। মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও ক্ষতিকর দিক থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করা ইসলামের শিক্ষা। বিশ্বশান্তি ও ধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য প্রয়োজন মানবাধিকার সংরক্ষণ।

৭.১. মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান

ইসলাম ব্যক্তি মানুষের সম্মানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংরক্ষণ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই আমি মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি।' (সুরা–তিন, আয়াত: ৪)।

সব মানুষ ভাই ভাই, কারণ সবাই একই পিতা-মাতার সন্তান। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃজন করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন; এরপর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী সম্প্রসারণ করেছেন। (সুরা–নিসা, আয়াত: ১)। ইসলামে ভৌগোলিক, আঞ্চলিক, নৃতাত্ত্বিক, জাতিগত ও ধর্মীয় প্রভেদে

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সমর্থন করে না। ইসলামি শরিয়ার ফিকহের বিধান হলো সব মানুষ পবিত্র, তাদের ঘামও পবিত্র। তা যেকোনো মানুষের জন্য, যেকোনো মোমিন মুসলমানের জন্য পবিত্র ও হালাল। ইসলামে কোনো প্রকার শ্রেণিবৈষম্য নেই, নেই কোনো অস্পৃশ্যতার স্থান।

৭.২. কর্মেই মানুষের পরিচয়

ইসলাম মানুষকে জাতি ও বর্ণ দিয়ে বিচার করে না; বরং তার বিশ্বাস ও কর্মের মূল্যায়ন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদের এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে অধিক সম্মানিত, যে অধিক সতর্ক ও সংযত। (সুরা-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)।

৭.৩. ইমানের জন্য শক্তি প্রয়োগ প্রযোজ্য নয়

ইমান বা বিশ্বাস হলো আদর্শ ও জীবনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এ ইমান আনার ক্ষেত্রে ইসলামে বল প্রয়োগের বা জবরদস্তির কোনো সুযোগ নেই। মানুষের কাছে সত্য ও মিথ্যার, ন্যায় ও অন্যায়ের, হেদায়াত ও গোমরাহির বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা ছিল নবী-রাসুলদের দায়িত্ব। ইমান আনা না-আনার বিষয়টি মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও ইচ্ছার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'দ্বীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য ভ্রান্তি থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা-বাকারা, আয়াত: ২৫৬)। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'বলো, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করুক।' (সুরা–কাহাফ, আয়াত: ২৯)।

৭.৪. বিশ্বাসের জন্য কটাক্ষ নয়

বিশ্বাস মানুষের অন্তরের বিষয়; কর্মে তা কখনো প্রকাশ পায় আবার কখনো প্রকাশ পায় না। বিশ্বাস গড়ে ওঠে জ্ঞানের আলোয়; বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া যায় না। এ জন্যই যার যার বিশ্বাস তার তার; তাই কারও বিশ্বাস নিয়ে বিদ্রূপ, কটূক্তি বা কটাক্ষ করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ; গাল–মন্দ ইসলামে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা আল্লাহ ছাড়া যেসবকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিয়ো না; ফলে তারা আল্লাহকে গালি দেবে শত্রুতাবশত অজ্ঞতার সঙ্গে। (সুরা-আনআম, আয়াত: ১০৮)।

৭.৫. ইসলামে নিরাপত্তাই প্রথম

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।' (সুরা-কুরাইশ, আয়াত: ৩-৪)। অর্থাৎ তাদের উচিত বায়তুল্লাহ তথা কাবা শরিফের রবের ইবাদত-বন্দেগি করা, যিনি ক্ষুধা ও ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা বিধান করেছেন। মানুষ দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে চায় সব ধরনের ভয়ভীতি থেকে তার জান, মাল, ইজ্জত, আব্রু হেফাজতের নিশ্চয়তা। ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রতিটি দিক ও বিভাগেই রয়েছে মানুষের সব অধিকারের বাস্তব প্রতিফলন। নবী-রাসুলদের আগমন ও আসমানি কিতাবের মূল লক্ষ্য মানুষের সমাজে প্রকৃত শান্তি, কল্যাণ ও ইনসাফ নিশ্চিত করা। সর্বশেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন এবং সর্বশেষ কিতাব আল-কোরআন নাজিলের চূড়ান্ত লক্ষ্য এটাই। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবার জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এর মূল লক্ষ্য।

৭.৬. ইসলামে বিশ্বভ্রাতৃত্ব

বিশ্বময় চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম মানবভ্রাতৃত্ব তথা বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে একই পরিবারভুক্ত মনে করে। ইসলাম মনে করে, সব মানুষই এক আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি প্রত্যেক মানুষকেই মানবীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টির সেরা করেছেন। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে সব মানুষের উৎপত্তি এক আদম ও হাওয়া থেকে। ইসলাম আরও শিক্ষা দেয়, হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে পরবর্তী সব নবী-রাসুল যেমন: হজরত নূহ (আ.), হজরত ইব্রাহিম (আ.), হজরত মুসা (আ.), হজরত ঈসা (আ.), হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রত্যেকেই ছিলেন ভাই ভাই এবং তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্বঘোষণা না থাকলে তারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায়, তার মীমাংসা তো হয়েই যেত।' (সুরা-ইউনুস, আয়াত: ১৯)।

৮. ইসলাম ও বিজ্ঞান

ইসলাম নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর যুগ থেকে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের প্রচার করেছে। আজকের আধুনিক বিশ্বেও ইসলামের আদর্শ বিজ্ঞান-বিশ্বাস ও অন্বেষণের প্রতি উন্মুক্ত।ইসলাম এবং বিজ্ঞান বলতে বোঝানো হয় ইসলাম ধর্ম ও এর অনুসারী মুসলমানদের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ককে।

মুসলিম পণ্ডিতেরা কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলির সাথে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছেন। কুরআন মুসলমানদের প্রকৃতি অধ্যয়ন এবং সত্য অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহ দেয়। মুসলিমরা প্রায়ই সূরা আল-বাকারা থেকে ২৩৯ নম্বর আয়াত উদ্ধৃত করেন — যার অর্থ:

তিনি তোমাকে তাই শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না।

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে কুরআন নতুন জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ প্রদান করে।

কিছু মুসলিম লেখকের মতে, বিজ্ঞান অধ্যয়নের মূল উৎস হলো তাওহীদ বা একত্ববাদের বিশ্বাস।মধ্যযুগীয় মুসলিম সভ্যতার বিজ্ঞানীরা, যেমন ইবনে আল-হায়থাম,

আধুনিক বিজ্ঞানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।এই ঐতিহাসিক অবদান আজও মুসলিম বিশ্বে উদযাপন করা হয়।

তবে একই সময়ে, মুসলিম বিশ্বের বহু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

কিছু মুসলিম লেখক দাবি করেছেন যে কুরআনে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বক্তব্য রয়েছে, যা পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সবাই একমত নন।

৯. ইসলামের দৃষ্টিতে সমকালীন চ্যালেঞ্জসমূহ

বিশ্বায়ন, আধুনিকতা, ও বিশ্ব রাজনীতিতে ইসলামিক জীবনধারার গ্রহণযোগ্যতা, কিছু ভুল ধারণা, উগ্রবাদ এবং সমাধানের পথ নিয়ে আলোচনা।

সারা বিশ্বে ঘরে-বাইরে ইসলাম আজ নানামুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইসলামের ভিতরকার নানারকম টানাপোড়েনকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিশ্বব্যাপী বাইরের দিক থেকে মানে অমুসলিমদের ও অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে যেসব সমালোচনাগুলো হয় সেগুলোকে পথভ্রষ্টতা, অজ্ঞতা বা শত্রুতা হিসেবে এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ইসলামের সীমানার ভিতরে থেকে যেসব মতপার্থক্যের বা মতবিরোধিতার সৃষ্টি হচ্ছে, এগুলো এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। খুব সাধারণ ভৌগোলিক সেন্সে, ইসলামের মূল কেন্দ্রসমূহকে তার অবস্থান পরিবর্তনের হাত হতে রক্ষা করার কথা বলা যায়। যেমন, সৌদিআরবের মক্কা-মদীনা হচ্ছে ইসলামের মূল ধর্মীয় পবিত্র ভূমি, প্রতিবছর এখানে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়, এর মাধ্যমে সৌদিআরব মুসলিম বিশ্বে তার অভিভাবকত্ব ধরে রেখেছে, কিন্তু শিয়ামতাবলম্বী ইরান ও আরো কিছু ক্ষুদ্র মতাদর্শের দল এর বিরোধীতা করে আসছে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রাখবার ফলে সৌদিআরব বেশ জোরালোভাবেই এ ধরণের বিরোধীতাকে নাকচ করতে পারছে। এক সৌদিআরবের যে পরিমাণ তেলসম্পদ আছে, তা কুয়েত, ইরাক, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ইরান, ইয়েমেনের সম্মিলিত আয়ের কাছাকাছি। কিন্তু এ সম্পদের উৎস সীমিত। তাই কয়েক বছরের মধ্যেই এই অর্থনৈতিক কেন্দ্র মুসলিম বিশ্বের আরেক প্রান্তে স্থানান্তর হবে যেখানে শক্তির স্থিতিশীল উৎস পাওয়া যাবে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি উতপন্ন হবে।পশ্চিম এশিয়ার

অর্থবিনিয়োগকারীরা অনেকদিন ধরেই এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা উপলব্ধি করছেন, কিন্তু তারা পশ্চিমা বিশ্ব এবং অমুসলিমদের উপর নির্ভর করে বসে আছেন। অন্যদিকে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র হচ্ছে মিশরের কায়রো। এখানে যেসব আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার চর্চা হয় তা সারা বিশ্বের মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো যেমন- ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশগুলোর মাধ্যমে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন কেন্দ্রের ক্ষমতার স্থানান্তর হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে পবিত্রভূমির দাবীর পক্ষে-বিপক্ষে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম কমিউনিটি বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। রক্ষণশীল কেন্দ্রসমূহ অধিকতর শক্তিশালী, যোগ্যতাসম্পন্ন ও উদার মুসলিমদের চাপের মুখে কোনঠাসা হয়ে পড়ছে।

যদিও ইসলামে আদর্শিকভাবে সাম্য এবং উন্নয়নমুখী পার্থিব জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়, কিন্তু বিপুল সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবন-যাপনের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ের, যেকোন মানদন্ডের বিচারে যার কোন অবস্থানই নেই। এবং এ প্যারাডক্স সম্পদশালী তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতেই বেশি প্রতীয়মান হয়। যেখানে আদর্শগত দিক থেকে ইনসাফ এবং ভাতৃত্ববোধের চর্চা হবার কথা, সেখানে দেখা যাচ্ছে একদিকে ধনী মুসলিম দেশগুলো বিলাসবহুল জীবন-যাপন করছে, দামী দামী সব মিলিটারী অস্ত্র-শস্ত্র কিনছে, অন্যদিকে ফিলিপিন, পাকিস্তান, ফিলিস্তিনের মতো দেশগুলো থেকে শ্রমিক আমদানী করা হচ্ছে! ১৯৯০-৯১-এর উপসাগরীয় যুদ্ধের পর এ পরিস্থিতি আরো বেশি নাজুক হয়েছে। অধিকাংশ জনগনের কর্মসংস্থানের অভাব, দ্রুত নগরায়ন, ভারসাম্যহীন উন্নয়ন প্রকল্প – সবকিছুই একসাথে শুরু হয়েছে মুসলিম উম্মাহর মাঝে। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মুসলিম সমাজে উপার্জন আর সম্পদের মাঝে বিস্তর ফারাক দেখা দিয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় তাদের মাঝে সম্পদের সুষম ও দক্ষ বন্টন হয়েছে খুব কমই।

ইসলামে সুদ হারাম হবার বিষয়ে পশ্চিমাদের মাঝে নানারকম কনফিউশন থাকার ফলে মুসলিম দেশগুলোতে উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ খুব ধীরগতিতে হয়। আবার মুসলিম বিনিয়োগকারীরা অমুসলিম দেশগুলোতেই নিজেদের অর্থ লগ্নি করতে স্বস্তিবোধ করে, কারণ সেখানে থেকে লাভও বেশি পাওয়া যায়, আবার ঐসব দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি অনেক স্থিতিশীল ও নিরাপদ। আবার কোথাও কোথাও মানুষজন যদি তার কমিউনিটির সুবিধার্থে বিনিয়োগ করতে চায়, তারাও নানাবিধ অন্যরকম সমস্যার মুখোমুখি হয়। বাংলাদেশে গ্রামীন ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে

নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে যা ব্যক্তি পর্যায়ে বা সামষ্টিকভাবে বিনিয়োগ করা যায়। সেখানে মূলধনের পরিমাণ খুব অল্প আর সুদও নির্দিষ্ট। মূলধন আগে পরিশোধ করতে হয়, এরপর বাকী থেকে যাওয়া অল্প পরিমাণ মূলধনের উপর সূদ নির্ধারিত হয়। বাতসরিক শতকরা ২০ ভাগ সুদ যদিও পরিমাণে বেশি মনে হয়, কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য মহাজনী সুদ ব্যবস্থার মাসিক ২০% সুদ বা বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর দৈনিক ১০% সুদের তুলনায় এটা নিতান্তই ক্ষুদ্র পরিমাণের। বানিজ্যিকভাবে দক্ষ নয় এমনসব লোককেই গ্রামীন ব্যাংক অর্থ ধার দেয়। জনগণকে ব্যাংকের অফিসারদের মাধ্যমে ট্রেনিং দেয়া হয় কিভাবে তাদের চাহিদা মোতাবেক সঠিক পন্থায় পুঁজি খাটাবে।

এ ধরণের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য থেকেই সমাজে নানারকম মতবিরোধ ও ক্ষোভ তৈরী হয়।সমানভাবে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলোর শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হওয়াও একটি কারণ।একইভাবে রাষ্ট্রগুলোর আধুনিক হবার মূল লক্ষ্যও এড়িয়ে যেতে পারে না।সমসাময়িক বিশ্বে সহনশীল জ্ঞানময় জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আধুনিকতার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট।আধুনিকতা মানে চলন-বলনে পশ্চিমাদের মতো হওয়া নয়, বরঞ্চ এর মানে হলো মুসলিম জ্ঞান-দর্শনে আরো কিছু সেকুলার ভাবধারা প্রবেশ করানো।ডঃ মাহাথির মোহাম্মদ এ বিষয়টিকে সুন্দরভাবে অনুধাবন করেছেন যে, সেকুলার আর ইসলামী জ্ঞান বলে দুটো আলাদা বিষয় থাকতে পারে না, এ ধরণের সব জ্ঞানই ইসলামের মাঝে আছে। তাই তো উনার মতো একজন প্রণিধানযোগ্য ও সফল মুসলিম নেতা এক হাতে এমন এক স্বাধীন এবং অগ্রসর মুসলিম আদর্শ গড়ে তুলেছেন যেখানে নানা বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা করা হয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা ও শ্রদ্ধাসহ এক চমৎকার নৈতিক শিক্ষাপদ্ধতিকে ধর্মীয় বিশ্বাস সমুন্নত রাখার একমাত্র পন্থা হিসেবে। বর্তমানে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবি নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন কিভাবে আধুনিক বিশ্বে মুসলিমদের পরিচয় তুলে ধরা যাবে, কিন্তু তারা পশ্চিমা মিডিয়ার কভারেজ পায় না, যেমনটা পায় কট্টরপন্থীরা।পশ্চিমা মিডিয়া কেবল সন্ত্রাসী আর উগ্রমনস্কদের প্রতিই আগ্রহী, অথচ যেখানে পশ্চিমা জনগণ রাজনীতিবিমুখ ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনযাপন নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে একদল শান্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবি নীরবে গবেষণা করে যাচ্ছেন মানব জীবনে আভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের কি ধরণের প্রয়োজনীয়তা আছে এর উপর।এই বুদ্ধিজীবিরা কেবল যে নিজ দেশে কট্টরপন্থীদের দ্বারা চাপের

মুখে থাকে তা নয়, এরা পশ্চিমাদের কাছ থেকে প্রাপ্য স্বীকৃতি, সহযোগিতা কোন কিছুই পায় না। এখন সময় এসেছে মুসলিম নেতাদের নিজ দেশে আধুনিকতার ধ্যান – ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার।আর ইজতিহাদের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ঠিক রেখে নীতিমালাগুলোর যুগোপযোগী ব্যাখা দাঁড় করানোর এবং সন্দেহজনক যে কোন কিছু যা বিভিন্ন সময়ে ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলোকে ছাঁটাই করে ফেলার।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সবকিছুই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্ব নির্ভর করবে কেবল পশ্চিমাদের করা উন্নতিগুলোর উপর তাহলে এজাতীয় ধ্যান-ধারণা অবশ্যই বর্জনীয়। এখানে মূল প্রশ্ন যেটা কেবল নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার আর এর উপর নির্ভরশীলতাই কি জীবনের দর্শন বদলাতে পারে, চাহিদার পরিবর্তন ঘটাতে পারে, সমাজে খুব বড় ধরণের পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে? যারা এসব নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করছে, দেখভাল করছেন, তারাই কি মানব জাতির নতুন নেতা বনে যাচ্ছেন? এসব জ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবিধাজনক বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো এ প্রযুক্তিগুলো কিভাবে ব্যবহার হবে, কি ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে, কারা এসবের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করবেন? এটা খুব সহজেই বোঝা যায় সেকুলার কর্তৃপক্ষ কখনোই এসবের জবাব দিতে পারবে না, তারা কেবল ব্যবহারের সাংখ্যিক মানের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কিন্তু গুণগত মানের কোন সিদ্ধান্ত দিতে তারা অপারগ।

এটা খুবই বিপদজনক যে মুসলিমরা কোন বাদ-বিচার না করেই পশ্চিমা যেকোন ধ্যান-ধারণা নিজেদের মাঝে গ্রহণ করে নিবে। তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের আলোকে যাচাই করে দেখতে হবে। যাদের ইসলাম সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ধারণা নেই, তারা ভাবে,

“ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যপূর্ণ কিছু নয়, বরং এটা একটা আংশিক জীবন ব্যবস্থা, আধুনিক বিভিন্ন মতাদর্শ সংযোজনের মাধ্যমেই তা পূর্ণতা পেতে পারে। এই ইসলাম সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হতে পারতো যদি এর কিছু মূল প্রতিশব্দকে পরিবর্তন করে নেয়া যেত যা কিনা অসতর্কভাবে নেয়া হয়েছে.........যারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ গঠনের ব্যাপারে জানেন, তারা খুব ভালভাবেই বোঝেন যে কোর ইসলামের কোনকিছুই পরিবর্তনীয় নয়।

পরিস্থিতি আরো খারাপ হয় যদি মুসলিমদের মাঝের নানা মতপার্থক্যকে খুব সিরিয়াসলি নেয়া হয় এবং তৃতীয় আরেক পন্থা খুঁজে বের করা হয়। যদি পশ্চিমাদের সবই বর্জন করা হয়, তাহলে ইসলামী ঐতিহ্যে সৃজনশীলতার আর উৎপাদনমুখী গতিশীলতার যে

সুযোগ আছে সেটা পুরোপুরি দমিয়ে ফেলা হয়। বর্তমান বিশ্বে ইসলামের যে পুনর্জাগরণ ঘটছে তাতে কি দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ-বালাই, অশিক্ষার মতো যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর প্রতি প্রর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়া হয়েছে?পুনর্জাগরণের কর্মীরা কি অতীত থেকে কিছু শিখেছে নাকি তারা এখনো নেশায় বুদ হয়ে আছে ইসলামী শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনার নিজ নিজ পছন্দের ভাষ্য নিয়ে?কি কি ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব প্রতীক ও সংস্কৃতির চর্চা করবে? তারা কি এখনো পুরোনো আইন-কানুন নিয়ে পড়ে আছে, নাকি আইনের যুগোপযোগী সংস্কারের কথা ভাবছে?সমাজে নারী এবং অন্যান্য ধর্মের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে এখনো কি কুরআন এবং সুন্নাহর শিক্ষার সাথে ধর্মান্ধদের মনোভাবের ফারাক আছে? এখনো কি রাজনীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে কাফেররাই ধর্মান্ধদের প্রধান সমস্যা?এখনো কি নিজেদের ব্যাখ্যাই একমাত্র ঠিক এই বলে উম্মাহ্‌কে বিভিন্ন গোত্রে বা দলে ভাগ করে দেয়ার প্রতিই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িকারীরা ব্যস্ত? এসব বিভিন্ন ব্যাখ্যার পক্ষে শেষপ্রান্তে অবস্থান নিয়ে কি মুসলিম উম্মাহর মাঝে নানা উপদলের সৃষ্টি হচ্ছে?

১০. উপসংহার

এই থিসিস পত্রে আমরা দেখেছি যে ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, বরং এটি জীবনধারার একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিশারী হিসেবে কাজ করে। ইসলামের শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক শান্তি ও কল্যাণেরও ভিত্তি স্থাপন করে। আধুনিক জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামের পথনির্দেশনা অবশ্যই যুগোপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক।এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তারপরও এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে মানুষের চাওয়া পাওয়ার যেন শেষ নেই। সবাই চাই একটি অর্থপূর্ণ সাফল্যমন্ডিত জীবন। তবে এ পৃথিবীর সাফল্যের সংজ্ঞা একেকজনের কাছে একেক রকম। কারো কাছে সাফল্য মানে বিশাল ব্যাংক ব্যালেন্স, বড় বড় অট্টালিকা, বাড়ি,গাড়ি ইত্যাদি। আবার অনেকে এই পৃথিবীতে সাদামাটা বসবাস করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্যে। তাদেরকে বলা হয় পৃথিবীর রক্ষক। তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবী টিকিয়ে রেখেছেন। কারণ যেদিন পৃথিবীতে আল্লাহকে ডাকার মতো একটা মানুষও থাকবে না, সেদিন আল্লাহ এই পৃথিবী ধ্বংস করে দিবেন। পৃথিবী রক্ষাকারীদের কুরআন ও হাদিসের

ভাষায় মুমিন বলা হয়। ইসলাম ও মুমিনের জীবন একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আল্লাহ তায়ালা জান্নাতের বিনিময় মুমিনের জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন, বলুন, আমার নামাজ, আমার সবরকম ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। (সূরা আন'আম: ১৬২)। তাই মুমিনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি অর্জন করা। পবিত্র আল-কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তায়ালা মুমিনের জীবন কেমন হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সে তো শুধু মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে। অবশ্যই তিনি (তার উপর) সন্তুষ্ট হবেন। (সূরা লাইল : ২০-২১)।

অর্থাৎ মুমিন কারো বন্ধুত্ব করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে , আবার কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করবে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন বিক্রি করে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন পুরষ্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। কিয়ামতের কঠিন সময়ে যখন কেউ কাউকে চিনবে তখন আল্লাহ তাদের আরশের ছায়ায় জায়গা করে দিবেন। আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যারা আমার জন্য পরস্পরকে ভালোবাসতে, তারা কোথায়? আজ তোমাদেরকে আমার আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেব। আজ আমার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই। (মুসলিম : ৪৬৫৫)।

মানুষ জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। স্বপ্নপূরণেও আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারপরও সবার সব স্বপ্নপূরণ হয় না। এজন্য মানুষ হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে, মহান আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু আল্লাহর বান্দা কখনো হতাশ হবে না। এই পৃথিবী তাদের জন্য পরীক্ষারক্ষেত্র। তাই তাদের জীবনে এই ক্ষণস্থায়ী সুখ তুচ্ছ বিষয়।

তারা সর্বদা আল্লাহর ওপর ভরসা করে। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সব গোনাহ মাফ করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার : ৫৩)। বর্তমানে আত্মহত্যা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষ আত্নহত্যার পথ বেঁচে নিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর বান্দার নিকট জীবন খুবই মূল্যবান নেয়ামত।

তারা বিশ্বাস করে, জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা আছে। এজন্য তাঁরা আল্লাহর দিকে একমুখী হয়। তাঁদের সামনে আল্লাহ তায়ালার নাম নিলে ভয়ে তাদের

অন্তর কেঁপে উঠে। পবিত্র আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয় তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তাঁরা নিজেদের রবের উপর ভরসা করে।’ (সূরা আনফাল : ২)। এছাড়া জীবনে কখনো জিনা ব্যভিচারে লিপ্ত, পিতা মাতার অবাধ্য, আমানতের খিয়ানত করা যাবে না। সর্বদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, হালাল উপায়ে উপার্জন, মানুষের হক নষ্ট করে না জীবন পরিচালনা করতে হবে। পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে জীবনের মূল্য বুঝার তৌফিক দান করুন।